# তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে

আল মেহেদী

# তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে

আল মেহেদী

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশনী

www.pathagar.com

তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে
রচনায়
আল মেহেদী

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০০৬

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
সাইফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে
তাসনিম কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, মগবাজার, ঢাকা

পরিবেশনায়
তাসনিয়া বই বিতান, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স

মূল্য : ৩০.০০ টাকা
Price: Tk. 30.00 US $ 4

www.pathagar.com

# ভূমিকা

আমরা বিশ্ব মুসলিম আজ ধর্মীয় কিছু বিষয় নিয়ে নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছুড়াছুড়িতে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ মনে করেন সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সা.)। আবার কেউ মনে করেন রাসূল (সা.) ও সাহাবীগণ উভয়ই সত্যের মাপকাঠি। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়িতে চরম অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে একদল মনে করেন ধর্মে রাজনীতি আছে। এ রাজনীতি সব ফরজের বড় ফরজ। আবার অন্য দল মনে করেন ধর্ম পবিত্র বিষয় আর রাজনীতি হলো ভাওতাবাজি। তাই ধর্মে রাজনীতি টেনে আনা চরম অন্যায়। আরও দেখা যাচ্ছে ধর্মের নামে বের হয়েছে বিভিন্ন পীর, ফকির, কবরপূজারী ইত্যাদি দল। এসব দলে যারা আছেন তারাও মনে করেন তারা হক পথে আছেন। সুতরাং এতো দল-উপদল সবাই তো আর হকপন্থী নয়। তন্মধ্যে একটি দলই হবে হকপন্থী ও জান্নাতী। তাই কে হক পথে আছেন এবং কে বিভ্রান্ত পথে আছেন তা আমাদের জানা একান্ত জরুরি।

অতঃপর আরও একটি দলের কথা বলতে হয়, তারা মনে করেন দাওয়াত ও তাবলীগের পথই একমাত্র নাজাতের পথ। তাই তারা মনে করেন চিল্লা ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। জীবনে একবার তিন চিল্লা না দিলে বেহেস্তে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ চিল্লা যারা দিচ্ছেন না তারা ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছেন। এ কারণে যারা চিল্লা দিচ্ছেন তারা জাগতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে নারাজ। এতে করে বিলাসী, দুর্নীতিবাজ, অসাধু ইন্দ্রীয় পূজারী জালিম নেতৃত্ব মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছে। অপরদিকে তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচীতে বাতিল তাগুতী শক্তিকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণের কোন জিহাদী চেতনা নেই। ফলে ভাল মানুষের একটা বিরাট অংশ এ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকায় দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন জোরদার হচ্ছে না। অপরদিকে এ কর্মকাণ্ড মানুষকে মহানবী (সা.) এবং তাঁর ঈমান দীপ্ত সংগ্রামী শহীদি কাফেলার সাহাবীগণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তাবলীগ জামায়াত মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এতে দ্বীন ইসলামের কতটুক লাভ-লোকসান নিহীত রয়েছে তা এখনি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

'তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে' এ বইটিতে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ জামায়াতের কর্মসূচীর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের কতটুকু লাভ-লোকসান হচ্ছে তা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ বইটি আমি কারও প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে লিখিনি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজাতের আশায় মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার নেক প্রচেষ্টা যদি আখেরাতে নাজাতের সন্ধানী মানুষকে শুভ সন্ধান দিতে পারে তবেই আমি ধন্য।

আমার লেখা এ পুস্তকটিতে আমি দ্বীনের সঠিক পথ কোনটি তা কোরআন হাদীসের আলোকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি এবং মুসলিম মিল্লাতকে ভ্রান্ত তরিকার লোকদের থেকে সতর্ক থাকার আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠক মহলের কাছে আমার আকুল আবেদন আমার লেখনিতে কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে সংশোধনের জন্য জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমীন।

বিনীত
আল মেহেদী

www.pathagar.com

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| হাশরের মাঠের ৭৩ কাতার সম্পর্কে কিছু কথা | ৫ |
| হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি ও শেষ নবী কেন? | ১১ |
| ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা কেন? | ১৯ |
| নবী, রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতি | ২৩ |
| ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক | ৩১ |
| ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের কুফল | ৪১ |
| রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ? | ৪৫ |
| তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে-১ | ৪৯ |
| তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে-২ (প্রশ্নোত্তর পর্ব) | ৫৪ |
| কেন এই গযব | ৬৩ |


www.pathagar.com

## হাশরের মাঠের ৭৩ কাতার সম্পর্কে কিছু কথা

মহাবিশ্বের সকল গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি চিরকাল স্ব-স্ব স্থানে অবিচল থাকবে না। একদিন না একদিন দুনিয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম অচল হয়ে যাবে। সেদিন বন্ধ হয়ে যাবে গ্রহ, নক্ষত্রের শূন্যে সন্তরণ। তখন গতিশীল গ্রহ, নক্ষত্রগুলো স্ব স্থান হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে মেতে উঠবে। পরিণামে মহাবিশ্বের বর্তমান কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। তারপর গঠিত হবে বিস্তৃর্ণ এক মাঠ। অতঃপর সেদিন আল্লাহ তায়ালার হুকুমে চারা গাছের ন্যায় মাটির নীচ থেকে সকল মানুষ গজিয়ে উঠবে। পরজীবনের সর্ববৃহৎ এই ঘাঁটির নাম হাশরের মাঠ। এখানেই সকল মানুষ আল্লাহর আদালতের সামনে দণ্ডায়মান হবে। এখান থেকেই নেকী, বদী দুই কাফেলায় বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামে চলে যাবে, সেদিন নেকীপ্রাপ্তগণ যাবে জান্নাতে আর বদীপ্রাপ্তরা যাবে জাহান্নামে। বলা হয় কাল হাশরের মাঠে সকল মানুষ দলে দলে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। দুনিয়াতে যার সাথে যার মিল থাকবে (কাজে, কর্মে, বিশ্বাসে) তার সাথেই তার কাতার হবে। সেদিন আমল অনুযায়ী সকল মানুষের ৭৩টি কাতার হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল বা কাতারের মানুষ হবে সৌভাগ্যবান। তারাই হবে বিনা হিসেবে জান্নাতী। আর বাকি ৭২ কাতারের বা দলের মানুষ হবে জাহান্নামী। রাসূল (সা.) বলেন- 'আমার এ উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি দল ব্যতীত সব দলই জাহান্নামী হবে। এরাই তারা যারা সর্বদা হকের পথে অটল থাকবে। কেউ তাদের বিরোধিতা করুক বা তাদেরকে অপমানিত করুক তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও তাদের বিরোধীরা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়।'

মানুষ হিসেবে আমাদের সন্ধান করা উচিত কি ধরনের গুণাবলী থাকলে বিনা হিসেবে জান্নাতী হওয়া যাবে এবং ১নং কাতারের দলভুক্ত হওয়া যায়। মূলত এ প্রচেষ্টাটুকু আমাদেরকে মৃত্যুর আগেই করতে হবে। কারণ মৃত্যু যবনিকার পরে কিংবা-হাশরের মাঠে ১নং কাতারের লোকদের গুণাবলীর পরিচয় জেনে কোন লাভ হবে না। অর্থাৎ তখন আর শত চেষ্টা করেও পৃথিবীতে ফিরে আসা যাবে না। কিংবা হাশরের মাঠেও পুণ্য বা নেকী কামানো যাবে না। সুতরাং দুনিয়াতেই ১নং কাতারের লোকদের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সাথে সাথে সে অনুযায়ী জীবন চালাতে হবে।

কুরআন পাকে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 'সেদিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখে নেবে।' (সূরা আয-যিলযাল-৬-৮)



www.pathagar.com

কাল হাশরের মাঠে নিজেদের কৃতকর্ম দেখার জন্য মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজেদের অণু পরিমাণ নেকী ও বদী দেখতে পারবে। সেদিন বদীর পরিমাপ বেশি হলে জাহান্নামে যেতে হবে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করতে হবে।

আমরা যারা আল্লাহকে ভয় করি এবং আমাদের মাঝে যাদের অন্তর জাহান্নামী আযাবের ভয়ে শিহরিত হয়, তাদের মাঝে অবশ্যই ১নং কাতারের মানুষের গুণাবলীর পরিচয় জানার স্পৃহা আছে। কেননা, একবার ভুল করে দুনিয়া থেকে চলে গেলে তা আর কোন কালেও শোধরানো যাবে না। জাহান্নামের আযাবের যন্ত্রণায় মৃত্যুকে ডাকলেও সেদিন মৃত্যু হবে না। কারণ এই দুনিয়ার প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুর বিধান থাকলেও পরপারের জীবনে মৃত্যুর বিধান চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে। সেদিন মৃত্যু দূতেরই মৃত্যু হয়ে যাবে। সেজন্য পরপারের জীবন হবে অফুরন্ত। এর শুরু আছে শেষ নেই। সেখানে চাঁদ সূর্যের মতো কোন গ্রহ নক্ষত্রের উদয় অস্তের প্রয়োজন থাকবে না। যেখানে আলো, সেখানে শুধু আলোই থাকবে এবং যেখানে অন্ধকার, সেখানে শুধুই অন্ধকার থাকবে। এভাবে যারা অন্ধকারে থাকবে তারা কোন দিন আলোর মুখ দেখতে পারবে না। সেদিন যারা ১নং কাতারের দলভুক্ত থাকবে তারাই হবে সৌভাগ্যবান। তাই আমাদেরও উচিত ১নং কাতারের লোকদের পরিচয় জেনে তাদের মতো আমল আখলাক ও ঈমানী চেতনা নিয়ে দুনিয়ার জীবন চালানো, তবেই আমরা হতে পারবো সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত। দুনিয়াতে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে সৌভাগ্যবান হতে চায় না। পাপী-তাপী সকলের মনেই সৌভাগ্যবান হওয়ার স্পৃহা আছে। কিন্তু পাপী তো আর সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। যে পরকালকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আযাব-গযবকে ভয় করে সেই হবে সৌভাগ্যবান। এ কথা যে বিশ্বাস করে তার জন্যই রয়েছে হেদায়েত।

আমরা জানি নবী-রাসূলগণ বেগোনাহ মাসুম। তাঁদের জীবন ফেরেস্তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই নবী-রাসূলগণ সকল ভুলের উর্ধ্বে। ফলে তাঁদের মাধ্যমে গোনাহর কাজ হয়নি। সুতরাং তারাই হবেন বিনা হিসেবে জান্নাতী। অতঃপর অন্য যারা নবী-রাসূলদের সাথে সৌভাগ্যবান হবেন তাদের মধ্যে নবী-রাসূলগণের সম-সাময়িক যুগের খাঁটি সাথীগণও থাকবেন। তারপর যারা থাকবেন তাঁরা হলো- যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের সঠিক দ্বীনের অনুসারীগণ তাহলে উপরের আলোচনা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, কাল হাশরের মাঠে ১নং কাতারের দলভুক্ত হবেন তিন শ্রেণীর লোক। যেমন– ১. নবী-রাসূলগণ ২. নবী-রাসূলগণের সমসাময়িক যুগের খাঁটি সাথীগণ ৩. নবী-রাসূলগণের দ্বীনের খাঁটি অনুসারীগণ।

বর্তমানে আমরা যে জামানায় বাস করছি, এ যুগে নবী-রাসূল আসার দরজা বন্ধ। তাই নবী আসার দরজা বন্ধ থাকায় তাঁদের সাথী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। এ কারণে আমাদেরকে সৌভাগ্যবান হতে হলে ৩নং শ্রেণীর দলভুক্ত হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান জামানায় সেই দলের পরিচয় পাওয়াই কঠিন। আমার


www.pathagar.com

এ প্রবন্ধ লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কি করে সহজে ৩নং শ্রেণীর সৌভাগ্যবান ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে নবী-রাসূল আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমাদেরকে নবীর সাহাবী হওয়ারও সুযোগ নেই। সে জন্য আমাদেরকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বীনের খাঁটি অনুসারী হতে হবে। তবেই আমরা হাশরের মাঠে ১নং কাতারভুক্ত হতে পারব। বর্তমান জামানায় আশেকে রাসূলের দল পাওয়া লবণের মতো সস্তা। যেমন পীর, ফকির, গাট্টিওয়ালা, খাজাবাবা, মাজারপূজারী, গাজারফকির, লালসালু, খানকাওয়ালা, ধর্মের নামে ভিক্ষুকের দল, এরা সবাই বলে আশেকে রাসূল। উভয় দলের লোকই মানুষকে নিজেদের দিকে ডাকে। কিন্তু এতো দলের লোকে ডাকছে, তাই আমরা যাবো কোথায়? সত্যিকার অর্থে এদের মধ্যে কারা নবী-রাসূলগণের খাঁটি আশেকে রাসূলের দল? এদের ওয়াজ নসীহত থেকে সাধারণ মানুষের পক্ষে রাসূল (সা.)-এর খাঁটি দ্বীনের অনুসারীর দল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু ভ্রান্ত আশেকে রাসূলের দল পাওয়া খুবই সহজ। সেজন্য কোরআন, হাদীসের সঠিক জ্ঞান না থাকলে দ্বীনের খাঁটি অনুসারীর দল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যত কঠিনই হোক তবু আমাদেরকে হাল ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ সৌভাগ্যবানদের শ্রেণীভুক্ত হতে হলে সেই দলের লোকদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।

আমরা জানি নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে যে কাজ করে গেছেন তাঁদের খাঁটি অনুসারী হতে হলে আমাদেরকেও সে কাজ করতে হবে। অতএব আমাদের জানা উচিত নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে কি কাজ করেছিলেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল মানুষকে গায়রুল্লাহর দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব ও হুকুম আহকাম মেনে চলার আহবান জানানো এবং আল্লাহকে সকল ক্ষেত্রে হুকুমদাতা, আইনদাতা ও বিধানদাতা মানার শিক্ষা দেয়া। এটা নবীআনা কাজের প্রথম দফার কাজ। এর সাথে ছিল দ্বীনে হককে বিজয়ী করার পরিকল্পনা। অতঃপর ২য় দফায় ছিল দ্বীনে হককে বিজয়ী করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। এগুলোই ছিল নবীআনা কাজের মূল মিশন। রাসূল (সা.) দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়ে একদল খাঁটি অনুসারী তৈরি করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে জামায়াতবদ্ধ। মূলত সকলে জামায়াতবদ্ধ হয়েই দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতাকারী কাফেরদের মোকাবেলা করেছিলেন এবং জামায়াতবদ্ধ হয়েই দ্বীনে বাতেলকে পরাস্ত করে দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর খাঁটি দ্বীনের অনুসারী হতে হলে আমাদেরকেও রাসূল (সা.) কাজের কিছু অংশ করলে এবং কিছু অংশ ছেড়ে দিলে কোন অবস্থাতেই রাসূলের (সা.) খাঁটি দ্বীনের অনুসারী হওয়া যাবে না।

আগেও বলেছি বর্তমান জামানায় নবীআনা কাজের হকপন্থী দলের দাবীদার অনেকেই? সকল দলেই কিছু না কিছু লোক আছে। যেহেতু একটি মাত্র দল বা কাতারের লোক সৌভাগ্যবান হবে, সে জন্য কোন শ্রেণীর দলভুক্ত হওয়ার আগে


www.pathagar.com

তাদেরকে কোরআন-হাদীসের আলোকে কষ্টি পাথরে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। অন্যথায় হুজুগে কোন একটিতে ঢুকে পড়লে বিভ্রান্তিতে জীবনটা কেটে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে নবীআনা কাজের (হকপন্থী দলের) লোকদের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। এগুলো নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরিদের মাঝেও বিদ্যমান থাকবে। অন্যথায় সত্য সন্ধানী মানুষ হকপন্থী লোকদের সন্ধান পাওয়াই হবে কঠিন। মুসলমানদের জীবন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটানোর কোন সুযোগ নেই। তাদেরকে অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ হয়ে চলতে হয়। তাই সত্য সন্ধানী মানুষদের উচিত যে দলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, সে দলের অর্ন্তভুক্ত হওয়া। অতএব হাশরের মাঠে ১নং কাতারভুক্ত হওয়ার জন্য বর্তমান জামানায় যাদের মাঝে নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে তাদেরকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। নিম্নে নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্যধারী লোকদের পরিচয় তুলে ধরা হল।

**নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য**

নবী-রাসূলগণ হকপন্থী। তাঁরা আজীবন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। নবীগণ যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতেন তখন সকল নবীর সময়ই দেখা গেছে দ্বীনে বাতেল বা বাতেলপন্থীগণ বাধা দিয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত হক হলে দ্বীনে বাতেল বা বাতেলপন্থীগণ বাধা দিবে এটাই চিরন্তন সত্য। তাই এটাকে নবীআনা কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। এটা বর্তমান জামানায় হকপন্থী দলের সন্ধান পাওয়ার প্রধান লক্ষণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে যখন নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলেন তখন যুগে যুগেই সমকালীন একদল পুরোহিত বা ধর্ম ব্যবসায়ী নবীআনা কাজকে সঠিক জেনেও তাঁদের বিরোধিতাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করেছে। বর্তমান জামানায়ও হকপন্থী দলের বিরুদ্ধে সেক্যুলার ধর্ম ব্যবসায়ীরা ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত। এটাও নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দাওয়াত হক হলে বাতেল ও সমকালীন সেক্যুলার পুরোহিত বা ধর্ম ব্যবসায়ীরা বিরোধিতা করবে এটাই রীতি।

আমাদের মাঝে অনেকেই দাবী করেন তারা হকপন্থী দ্বীনদার। কিন্তু আসলেই কি তারা একশত ভাগ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন? কারও কাজ একশত ভাগ নবীআনা কাজ কি না তা জানারও উপায় রয়েছে। আসুন আমরা নিজেদেরকে যাচাই করে দেখি। দ্বীনে হকের বৈশিষ্ট্য বা নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য হলো যাদের দাওয়াত হক হবে তাদের কাজে বাতেল, ধর্মব্যবসায়ী, খানকাওয়ালা, সেক্যুলারপন্থীরা একযোঁগে বিরোধিতা করবে। এখন আমরা নিজেদেরকে যাচাই করে দেখতে পারি আমরা দাওয়াতে দ্বীনের দাবীদার হয়ে আমরা যা করছি এ কাজে কি বাতেলপন্থী ও ধর্মব্যবসায়ীরা একযোগে বিরোধিতা করে কি না। যদি এরূপ কোন আলামত না থাকে তবে ধরে নিতে হবে আপনি যতই হকপন্থী দাবীদার হোন না কেন, আপনার কাজ একশত ভাগ হক নয়। আমাদের দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তায়েফের


www.pathagar.com

ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছেন। তৎকালীন ধর্মীয় পুরোহিতরা নবীকে সত্য জেনেও তাঁর বিরোধিতা করেছে। কাফেররা নবীকে হিযরত করতে বাধ্য করেছে। পরবর্তীতে নিজের জন্মভূমিতে আসতে ভিসা দেয়নি। হুদাইবিয়ার সন্ধি করে প্রথম বছর ফিরে যেতে হয়েছে। আর বর্তমান জামানায় রাশিয়ার মতো বাতেলপন্থী দেশ একদল লোককে দাওয়াতের কাজ করতে নির্দ্বিধায় ভিসা দিচ্ছে। আমরা কি ভেবে দেখেছি এ কাজটা যদি নিখুঁত নবীআনা কাজ হতো তবে কি তারা এভাবে ছেড়ে দিতো? নিশ্চয়ই না। তাই এটা নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। কারণ এটা একশত ভাগ নবীআনা কাজ হলে অবশ্যই দ্বীনে বাতেলের দেশে সহজে যাওয়া যেত না।

আমাদের দেশে অনেক রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের সাহায্যে চলে, এ সব প্রতিষ্ঠানে যারা কোরআনের আইন চায় না তারাও সাহায্য করে। অথচ এখানে কোরআনের শিক্ষাই দেয়া হয়। কিন্তু সেক্যুলারপন্থীরা বাধা না দিয়ে সাহায্য করার কি এমন রহস্য থাকতে পারে? সে রহস্যটা হলো তারা কোরআন পড়ালেও কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করার প্রোগ্রাম তাদের মধ্যে নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যারা কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদেরই বিরোধিতা করে। সুতরাং এদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি ঈমানের পরিপূর্ণ দাবী পূরণ করে না। তাই যারা কোরআনের আইন চায় না তারাও তাদের প্রতিষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করে। কিন্তু ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন দ্বীন হকের শিক্ষা সমাজের মানুষের কাছে প্রচার করছিলেন তখন নিজের পিতাও তাঁর বিরোধিতা করে ছিল।

আমাদের সমাজে কারও কারও কাজ একশত ভাগই বাতেল। আবার কারও কারও কাজ অর্ধেক ভাল এবং অর্ধেক বাতেল। কিংবা কেউ অর্ধেক ভাল কাজ অনুসরণ করেন (নামাজ, রোজা, হজ্ব, ইত্যাদি) আর বাকি অর্ধেক কাজ নিজে তো করেন না, পাশাপাশি এর কোন গুরুত্বও অনুধাবন করেন (দ্বীনে হককে বিজয়ী করার কাজ) না। এ ক্ষেত্রে তারা দ্বীনের কিছু অংশ পালন করেন এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেন। অতএব এটা একশত ভাগ নবীআনা কাজ হতে পারে না। কাল হাশরে এদের কি অবস্থা হবে তা আল্লাহ সূরা বাকারায় ঘোষণা করেছেন- 'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ আর কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ না? অতএব কি শাস্তি হতে পারে তার, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ করে, পার্থীব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত? আর কিয়ামত দিবসে নিক্ষেপ করা হবে তাকে বড় কঠিন আযাবের মধ্যে। আর আল্লাহ তায়ালা বেখবর নহেন তোমাদের কার্যকলাপ হতে।' (সূরা বাকারা আয়াত ৮৫)

## হকপন্থী দল চেনার উপায়

বর্তমান জামানায় আমাদের সমাজে অনেক জামায়াত বা দল দ্বীনের কাজ করছে। এদের সকলেই দাবী করে থাকেন তাদের কাজ হক ও নবীআনা কাজ।


www.pathagar.com

এতে করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনটি হকপন্থী দল তা বের করা কষ্টকর। তাই অনেকের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে একবার কেউ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলে সেখান থেকে বের হয়ে আসা কঠিন হয়। সুতরাং জীবন যদি বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে কেটে যায় তবে নির্ঘাত ক্ষতিগ্রস্তদের দলে পড়ে যেতে হবে। ফলে জীবনকে আর শুধরানো যাবে না। তাই নবীআনা কাজের বৈশিষ্টগুলো যে দলের মাঝে পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান থাকে সে দল তালাশ করে তাদের সাথে শরীক হয়ে ঈমানের দাবী পূরণ করাই যথার্থ। এ ক্ষেত্রে একশত ভাগ নবীআনা কাজ করাই হলো ঈমানের দাবী। এ কারণে আমাদেরকে নবীআনা কাজের দাবীদার হকপন্থী দলের সন্ধান করতে হবে। মূলত যাদের দ্বীনি কাজ একশত ভাগ নবীআনা পদ্ধতিতে হবে তাদেরকে চেনার উপায় হলো দু'টি। যেমন প্রথম দফায় তাদেরকে বাতেলপন্থীগণ একযোগে বাধা দিবে। এ বাধা বাতেল, কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তি, সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিগণ উভয়ের থেকে আসতে পারে। দ্বিতীয় দফায় সমকালীন ধর্মীয় পুরোহিত বা সুবিধাবাদী ফতোয়াবাজরা তাদের সম্পর্কে একযোগে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কায় দ্বীনে হকের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন দ্বীনে বাতেল এবং খৃস্টান ও ইহুদী বড় বড় পাদ্রি ও পুরোহিত (তৎকালীন ধর্মীয় আলেম) গণ নবীজীকে সত্য জেনেও তাঁর বিরোধিতা করেছিল। এদের মধ্যে দ্বীনে বাতেল হলো যারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদের উপর জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করত এবং আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করত। আর পাদ্রি ও পুরোহিতরা ছিল ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদী। এরা ধর্মের নামে সমাজকে শোষণ করত। তারা তাবিজ, কবজ, পানিপড়া, মানত, কবরে চিঠি লিখে দেয়া, দোয়া কালাম, দাওয়াত সিন্নি, ইত্যাদির নামে সমাজের অজ্ঞ লোকদেরকে শোষণ করত। নবীজী (সা.) যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিলেন তখন এসব কায়েমী স্বার্থবাদীরা রাসূলকে (সা.) বাধা দিতে শুরু করলেন। আজকের সমাজেও হকপন্থী দলের সবচেয়ে বড় বাধা হলো তৎকালীন বাতেল ও পুরোহিত শ্রেণীর মতো বর্তমানের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদী এবং প্রচলিত সেক্যুলারপন্থী দল ও রাষ্ট্রনায়কগণ। বর্তমানে আমরা দ্বীনে বাতেলকে সহজে চিনতে পারলেও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের সহজে চিনতে পারছি না। কারণ এদের গায়ের লেবাস ও আমল দেখে বাতেল মনে হয় না। তবে এদের চেনার উপায় হলো এরাও কোরআন দিয়ে তাবিজ, কবজ, পানিপড়া, দোয়া কালাম, দাওয়াত, সিন্নি, মানত ইত্যাদির মাধ্যমে অজ্ঞ লোকদেরকে শোষণ করে। এদের পোশাক দেখে যতই হাক্কানী মনে হোক না কেন, মূলত এরা হলো ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদী। এরা হতে পারে মসজিদের ইমাম কিংবা খানকাওয়ালা অথবা রাজনীতি নিরপেক্ষ (কোরআনী রাজনীতি) ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। এরা কোরআনের কিছু অংশ মানে। কিন্তু বৃহত্তর একটা অংশকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে পাশ কেটে চলে। অর্থাৎ কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে একেবারে মূল্যই দেয় না।


www.pathagar.com

যার ফলে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার কোন প্রোগ্রাম তাদের মধ্যে নেই। তাই তাদের কাজে বাতেলপন্থীরা নাখোশ নয়। বরং তাদেরকে সার্বিকভাবে বাতেল সহযোগিতা করে। কিন্তু নবী-রাসূলগণের মাঝে সাধারণ মানুষদের চেয়ে চারটি গুণ বেশি থাকার পরও বাতেল ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীগণ একযোগে বাধা দিয়েছে। নবী-রাসূলদের এ ৪টি গুণ হলো- ১. তাঁরা ছিলেন বেগোনাহ মাসুম, ২.উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ৩. নবুয়ত প্রাপ্ত ৪. বিশেষ বিশেষ মোজেজার অধিকারী।

এসব বাড়তি গুণগুলো থাকার পরও দ্বীনে বাতেল ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরা নবীদের বিরোধিতা করেছে।

আজকের যুগেও হকপন্থী জামায়াতের এরূপ দু'ধরনের শ্রেণীর লোক একযোগে বিরোধিতা করছে। মূলত যাদের কাজ নবীআনা পদ্ধতিতে হবে তাদেরকে বাতেল ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থবাদীরা একযোগে বাধা দিবে এটাই হলো নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য ও হকপন্থী দল চেনার উপায়।

অতএব হকপন্থী জামায়াতের সন্ধান পেতে হলে এরূপ বাতেলপন্থী দু'টি শ্রেণীকে চিহ্নিত করে সত্য দ্বীনি জামায়াতের সন্ধান করতে হবে। তাহলেই হাশরের মাঠে ১নং কাতারভুক্ত হওয়া যাবে।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.) একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি ও শেষ নবী কেন?

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার খাঁটি কর্মপদ্ধতি। সকল কর্মপদ্ধতিরই একটি মাত্র আদর্শ নীতি বা মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই নীতি বা একই মাপকাঠি অনুসরণ করা সহজ হয়। তা না হলে একাধিক নীতি বা পদ্ধতি চালু হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন বর্তমান জামানার মুসলমানদের মধ্যেই দেখা যায়-এক শ্রেণীর লোক আছে যারা পীরপূজা, মাজারপূজা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। এরা মাথায় লম্বা চুল গোঁফ দাড়ী রেখে পীরকে পূজা করে। আবার কেউ লালসালু পরে গাজার ফকির সেজে জীবন চালায় এবং অনেকে নবীকে (সা.) সত্যের মাপকাঠি মানার সাথে সাথে সাহাবীগণ ও অন্যান্য পীর বুর্জুগকেউ সত্যের মাপকাঠি মনে করে। পাশাপাশি তাদের অজিফা ও হুকুম আহকাম দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে পালন করে। এতে করে অসংখ্য জীবন পদ্ধতি দুনিয়ায় চালু হয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই নিজেদের দল প্রধানকে দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থার) প্রকৃত মাপকাঠি মনে করে। ফলে একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। আমাদের মাঝে এমনও আকিদাগত লোক আছে, যারা নবীকে (সা.) একমাত্র সত্যের মাপকাঠি মনে করায় তাদেরকে ভ্রান্ত হিসেবে ফতোয়া দেয়। তাই জিজ্ঞাসা জাগে প্রকৃত সত্যের মাপকাঠি কি? এবং কার কথা ও কাজ অনুসরণ করা বৈধ। এ ব্যাপারটি বর্তমান জামানার সত্য সন্ধানীদের মহতী দাবী। অর্থাৎ এর মাধ্যমে


www.pathagar.com

আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। দূর হতে পারে সকল বিভ্রান্তি। কারণ আমাদের দেশের আলেম সমাজের মধ্যে মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন অনেক আলেম আছেন যারা নবীজিসহ সাহাবাগণকেও সত্যের মাপকাঠি মনে করেন। আর একদল মনে করেন নবীজীই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি এবং সাহাবাগণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নবীজীর খাঁটি অনুসারী। এর ফলে আলেমদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক ফাটল। এ সব কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ড যারা চালায় তারা মনে করে এর প্রবর্তক হলো বর্তমান জামানার সত্যের মাপকাঠি। এ জন্য তারা এটাকে একমাত্র নাজাতের পথ হিসেবে প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালান। জীবনে তিন চিল্লা, বছরে এক চিল্লা, মাসে তিন দিন এবং রোজানা তালিমকে সফলতার পথ মনে করেন।

তাই আমাদেরকে সত্যের মাপকাঠির প্রকৃত রহস্যটি অনুধাবন করতে হবে। সাথে সাথে এমন একটি ফয়সালায় উপনীত হতে হবে যার মাধ্যমে ঐক্যের পথ সুগম হয়।

কোন কিছু পরিমাপের জন্য আমরা সাধারণত একটি স্ট্যান্ডার্ড মাপকাঠি ব্যবহার করি। উহাদরণ স্বরূপ বলা যায়- আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ দৈর্ঘ্যের পরিমাপের জন্য হাতের কনুই থেকে মধ্য আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে এক হাত ধরে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করত। অপরদিকে ইংরেজরা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের প্রস্থকে এক ইঞ্চি ও পায়ের পাতার দৈর্ঘ্যকে এক ফুট ধরত। আবার কোন কোন অঞ্চলে ধান চাল মাপা হত নির্দিষ্ট আকারের কাঠা দিয়ে এবং সোনা রূপা মাপা হত বিভিন্ন আকারের মুদ্রা দিয়ে। আর সময়ের পরিমাপ করত সূর্যের ছায়া দেখে। কিন্তু এসব পরিমাপ প্রায় সময়ই ঠিক হত না। তাছাড়া তখনকার সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথাও কোন পরিমাপের নির্ধারিত কোন স্ট্যান্ডার্ড একক ছিল না। এতে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায় অনেক অসুবিধা দেখা দিত। ফলে সকল ক্ষেত্রে সব দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্দিষ্ট ও নির্ভুল একক ঠিক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই আলোকে ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ মিলে একটি মাত্র একক পদ্ধতি চালু করেন। এটিই আন্তর্জাতিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের এক সেকেন্ড।

প্যারিসের নিকটে স্যাভ্রেতে রাখা একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে মিটারের আদর্শ মাপকাঠি ধরা হয়। আর প্লাটিনাম ইউরিনিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিন্ডারের ভরকে এক কিলোগ্রাম ধরা হয়। এটির ব্যাস ৩.৯ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৩.৯ সেঃ মিঃ। ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েটস এন্ড মেজরস-এ এটি রক্ষিত আছে। সময়ের এককের বেলায় একটি সিরিয়াম-১৩৩ পরমাণুর ৯১৯২৬৩১৭৭০ টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে এক সেকেন্ড বলা হয়।


www.pathagar.com

পৃথিবীতে মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটানোর জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে উল্লেখিত যে স্ট্যান্ডার্ড মাপকাঠি ঠিক করা হয়েছে তার প্রয়োজন হলো দুটি যেমন- ১। নির্ভুল পদ্ধতি ঠিক করা, ২। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সাম্যতা আনয়ন ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করা। পৃথিবীর সবদেশে সর্বক্ষেত্রে যেন একই স্ট্যান্ডার্ড একক বা মাপকাঠি ঠিক থাকে সেটিই হলো এর একমাত্র মূল উদ্দেশ্য। এক দেশে কেজি পাথর দিয়ে পরিমাপ করবে আর অন্য দেশে সের দিয়ে পরিমাপ করবে কিংবা অন্য কোন এককে, এটা যেন না হয় সেটাই ছিল বৈজ্ঞানিকদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। এ ব্যাপারে তারা সফলও হয়েছেন। অপরদিকে বৈজ্ঞানিকগণ পরিমাপের মূল একক মাপকাঠিগুলো নমুনা হিসেবে (অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত) ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের জন্য প্রতিক্ষেত্রে একটি মাত্র একক মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। আরও প্রমাণ হয় যে, ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে সুরক্ষিত মাপকাঠির সাথে পৃথিবীর যত মাপকাঠির মিল থাকবে সেগুলোও নির্ভুল হবে। এ ক্ষেত্রে সুরক্ষিত মূল মাপকাঠির মাধ্যমে অন্যগুলো নির্ভুল আছে কি না তা যাচাই-বাছাই করা যাবে এবং সকল ক্ষেত্রে মূল এককই হবে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। অন্যগুলো নির্ভুল হলেও অনুসরণ ও অনুকরণ করা যাবে না। এতে স্থান বিশেষে চুল পরিমাণও যদি কম বেশি হয়ে পড়ে তবে অন্যগুলোতেও তার অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটি হবে তা হলো প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিসরে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মাপকাঠি দাঁড় করাবে। এতে কালের বিবর্তনে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেই পরিমাপের স্ট্যান্ডার্ড এককের নমুনা ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন।

পরিমাপের ক্ষেত্রে এ দীর্ঘ আলোচনা রাখার প্রয়োজন মনে করেছি এ জন্য যে, একক বা স্ট্যান্ডার্ড মাপকাঠির প্রয়োজনীয়তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে রয়েছে তা বুঝানো। এর মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, মানবজীবন পরিচালিত করতে হলেও একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপকাঠির প্রয়োজন। কোন বিবেক বুদ্ধিশীল মানুষ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে বলে আমি মনে করি না। পৃথিবীর সকল দেশের জন্য একটি মাত্র একক (প্রত্যেক পরিমাপের ক্ষেত্রে) নমুনা যেমন রয়েছে তেমনি মানুষের জীবন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্যও একটি মাত্র একক অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় নমুনা থাকার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্যতা বজায় থাকবে এবং বিচ্ছিন্নতা রোধ হবে। পাশাপাশি জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা নির্ভুল একক জীবন ব্যবস্থা পাওয়া যাবে। এ বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করি না বলে পৃথিবী জুড়ে হাজার রকমের জীবন ব্যবস্থা প্রণিত হয়েছে। যেমন মুসলমানদের মধ্যেই কেউ আছে মাজারপূজারী। কেউ করে পীরপূজা কেউ আবার ধর্মের নামে রাজনীতি বিশ্বাস করে না। তাছাড়া আরও রয়েছে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদীর দল। এরা চিল্লায় গিয়ে মানুষকে নামাজ রোজার দাওয়াত দেন কিন্তু দ্বীনে হককে বিজয়ী করার কোন পরিকল্পনা তাদের নেই।


www.pathagar.com

অপরদিকে ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিকদের তো জীবন ব্যবস্থার শেষ নেই, এদের মাঝে আছে বৈরাগ্য, সন্ন্যাসী, দেবদাসী, বহুকামী, সমকামী আরও কত বিচিত্র রকমের জীবন ব্যবস্থার লোক, যা বলে শেষ করা যাবে না।

বৈজ্ঞানিকগণ পরিমাপের একক নির্ণয় করেছেন বটে কিন্তু মানুষের জীবন ব্যবস্থার নমুনা ঠিক করার চিন্তাও করেনি। তবে এ কাজটা সাধারণ মানুষের পক্ষে করাও সহজ নয়। কারণ এতে অসংখ্য দুর্বল দিক থেকে যাবে। মানুষ ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নফস্ ও বিবেক। তাই জীবন ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় মানুষ যেহেতু নফসকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না, সে কারণে নফসের তাগিদেই সে ইচ্ছার বাইরে আইন প্রণয়ন করে বসে। এতে জীবন ব্যবস্থা নির্ভুল রাখা যায় না। তাই মানুষের জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্রষ্টাই অহীর মাধ্যমে ফেরেস্তাগণের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রেখে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণ নমুনা হিসেবে ঠিক করে দিয়েছেন। উম্মতের জন্য সেই সৌভাগ্যবান অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি হলেন আমাদের দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনিই জীবন ব্যবস্থার আদর্শ পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি। ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে যেমন দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের মাপকাঠির নমুনা সুরক্ষিত আছে তেমনি কোরআন, হাদীসে রাসূল (সা.) এর জীবন ব্যবস্থার আদর্শ নমুনা মাপকাঠি হিসেবে সুরক্ষিত রয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন যেমন একজন শিশুর জন্য আদর্শ মাপকাঠি তেমনি কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্যও তিনিই আদর্শ নমুনা। তিনি ব্যতীত আর কাউকে এমন পাওয়া যাবে না যিনি জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের আদর্শ নমুনা হতে পারেন। এর কারণ হলো নবীকে (সা.) আল্লাহ অহীর মাধ্যমে পরিচালিত করতেন এবং তিনি সার্বক্ষণিক ফেরেস্তাগণের হেফাজতে থাকতেন। প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা রোধ করার জন্য আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী করে পাঠিয়েছেন। তাই অহীর মাধ্যমে অন্য কেউ পরিচালিত হওয়ার বিধানও রহিত হয়ে গেছে। সে জন্যই নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ব্যবস্থাই মানব জাতির একমাত্র আদর্শ পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি। পাশাপাশি অন্য যাদের চরিত্র আমল, আখলাক নবীজীর (সা.) জীবন ব্যবস্থার সাথে পুরাপুরি মিল রয়েছে তাদের জীবন ব্যবস্থাও নির্ভুল। তবে তাদের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ, অনুকরণযোগ্য নমুনা নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের জীবন ব্যবস্থা নবীজীর (সা.) জীবন ব্যবস্থার সাথে যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে। কিন্তু নবীজীর (সা.) জীবন ব্যবস্থা যাচাই-বাছাই করার উর্ধ্বে। এ ক্ষেত্রে নবীজীর জীবন ব্যবস্থা হলো 'একক নমুনা' বা সত্যের মাপকাঠি। এর মাধ্যমে অন্যদের জীবন ব্যবস্থা নির্ভুল কিনা তা যাচাই-বাছাই করে দেখা যাবে। অপরদিকে সাহাবীদের জীবন ব্যবস্থা প্রেরণা পাওয়ার যোগ্য নমুনা। সাহাবীদের পুরা জীবনটা (শিশু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) সত্যের অনুকরণীয় মাপকাঠি ছিল এমন নয়। কালেমা গ্রহণ করার আগে তাদের অনেকের জীবন পদ্ধতি ছিল চরম জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। জীবনের যতটুকু সময় চরম জাহেলিয়াতে


www.pathagar.com

কেটেছে সেটুকুকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরা যাবে না। কিন্তু নবীজী শিশুর জন্য যেমন আদর্শ নমুনা তেমনি কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শিশু নবী যখন হালিমার কোলে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখনও তিনি তার দুধ ভাইয়ের হক নষ্ট করেননি। শিশু নবী দুধ মার একটি মাত্র স্তন পান করে ইনসাফের আদর্শ নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কিশোর অবস্থায়ও তিনি কখনো আরবের জাহেলিয়াত প্রথা অনুসরণ করেননি। যেমন- গান-বাজনায় যাওয়া, উলঙ্গ হওয়া, দেব দেবীর মূর্তি পূজায় গমন ইত্যাদি কোনটিতেই তিনি যাননি। এ জন্যই নবীজীর জীবন পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য আদর্শ পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি। এখানে সত্যের মাপকাঠির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যিনি সত্যের আদর্শ মাপকাঠি হবেন শুধু তাঁর কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধ উম্মতের জীবন ব্যবস্থার আইন হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারও কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধ উম্মতের জন্য আইন হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়। তাই সকল ক্ষেত্রে একটি মাত্র 'একক' জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতিই হবে সত্যের আদর্শ মাপকাঠি।

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর একটা সময় এমন হয়েছিল যে তখন অনেকেই এ কথাটি ভুলে যান। ফলে বিভিন্ন মতাদর্শের উৎপত্তি ঘটে। যেমন শিয়া, সুন্নী, খারেজী, মুতাজিলা ইত্যাদি। বর্তমানেও দেখা যায় মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ হযরত আলী (রাঃ)-কে অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারাই শিয়া নামে পরিচিত। শিয়াদেরকে অন্যরাও (সুন্নীগণ) ভালো চোখে দেখেন না। কিন্তু যারা সাহাবীদেরকেও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে মনে করেন তাদের মধ্যে শিয়াদেরকে খারাপ চোখে দেখার লোক অনেকেই আছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কতটুকু নিজের কথা ও কাজের সাথে একাগ্র আছেন তা হয়ত তারা মিলিয়ে দেখেন না। তারপর এসেছে চার মাজহাবের কথা। এখানেও পরোক্ষভাবে মাজাহাবের নেতার কথা ও দিক-নির্দেশনাকে অনুসরণ ও অনুকরণীয় মাপকাঠি হিসেবে দ্বীনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁদের কোন না কোন কথা, ও মতামত দ্বীনের ক্ষেত্রে অনুসরণ ও অনুকরণীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ঢুকেছে বড় আকারে পীর, ফকিরদের অজিফা, কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধসহ তাদের ব্যক্তিগত অজিফাগুলো দ্বীনের ক্ষেত্রে অনুসরণ, অনুকরণীয় হয়ে পড়েছে। এভাবে দ্বীনি আমল তথা জীবন ব্যবস্থার রীতি-নীতিতে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রথা গড়ে উঠেছে। যার সাথে রাসূলের (সা.) জীবন পদ্ধতির অনেক অমিল। ফলে ক্রমে দ্বীনি জীবন ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এর উদ্ভব ঘটেছে দ্বীনের ক্ষেত্রে যাকে তাকে সত্যের মাপকাঠি মনে করার জন্য।

আমাদের সমাজে একদল আলেম (নিজেদেরকে হাক্কানী বলে দাবী করেন) নবী (সা.)-কেও সত্যের মাপকাঠি মনে করেন আবার সাহাবীদেরকেও সত্যের মাপকাঠি বলে থাকেন। এবং পীর, ফকির, বুজুর্গ ও মুরব্বীদেরকেও সত্যের মাপকাঠি দাবী করেন। এ ক্ষেত্রে তারা এতো বড় ভুল করেন যা ক্ষমার অযোগ্য। যেমন তারা নবী


www.pathagar.com

(সা.) ও সাহাবাগণকে একই কাতারে নিয়ে আসেন। আল্লাহর মর্যাদার সাথে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা এক করা যেমন গোনাহের কাজ তেমনি নবী-রাসূল ও সাহাবীদেরকে একই মর্যাদা দেয়া গোনাহের কাজ। আমরা নবী ও রাসূলগণের নামের শেষে (আঃ) ও (সা.) বলি আর সাহাবীগণের নামের শেষে বলি (রাঃ) । এ ক্ষেত্রে কিন্তু উভয়কে সমান মনে করি না। সাধারণ মানুষের থেকে নবী-রাসূলগণের চারটি গুণ অতিরিক্ত থাকে। যেমন- ১। নবীগণ বেগোনাহ মাসুম, ২। উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ৩। নবুয়ত প্রাপ্ত, ৪। বিশেষ মোজেজার অধিকারী। এবং নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ফেরেস্তার মাধ্যমে সরাসরি পরিচালিত হয়ে থাকেন। এসব গুণগুলো একত্রে সাধারণ মানুষের মাঝে থাকে না। এখন বলুন যাদের এতোগুলো গুণ আছে তাদেরকে কি সাধারণ মানুষের মর্যাদায় নিয়ে আসা ঠিক হবে? তাই যারা নবী-রাসূল ও সাধারণ মানুষকে (যারা নবুয়ত প্রাপ্ত নয়) একই কাতারে নিয়ে আসেন, মূলত তাদের ভুল ক্ষমার অযোগ্য নয় কি? একজনকে বেশি মর্যাদা দিতে গিয়ে অন্যজনকে (নবীকে) খাটো করা কি ঠিক হবে? এতে দেখা যায় অনেককে সত্যের মাপকাঠি ধরে নিলে দ্বীনের বিচ্ছিন্নতা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর উদাহরণে বলা যায় রাসূল (সা.) যে কাজটি যেভাবে করেছেন, সেটি সেভাবে করা এবং তিনি যা হালাল ও হারাম বলেছেন তা সেভাবেই জানা ও মানা ইবাদত। এ ক্ষেত্রে হারাম, হালাল ও জীবন পদ্ধতির পথ দেখানো নবীগণের বেলাই প্রযোজ্য। তবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আসার পর তাঁর আগের সমস্ত নবীর জীবন পদ্ধতি মুলতবি হয়ে গেছে। দ্বীনের বিচ্ছিন্নতা রোধ করার জন্য আগেরগুলো মুলতবি হওয়াই যুক্তিপূর্ণ। মূলত নবী-রাসূলগণের দেখানো দ্বীনি নিয়ম পদ্ধতি ছাড়া অন্যদের ভাল কাজ ও কথা আমল করা বেদ'আত। উহাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেউ যদি এক হাজার বার কিংবা এক লক্ষ বার আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে বলেন, তবে এটি ভাল মনে করেও করা যাবে না যদি এতে নবীজীর কোন নির্দেশ না থাকে। এটিই সত্যের মাপকাঠির অন্তর্নিহিত দাবী। কিন্তু সাহাবীদেরকে যদি সত্যের মাপকাঠি ধরা হয় তবে তাঁরাও যে কাজটি যেভাবে করেছেন, বলেছেন সেভাবেই মানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- কোন কোন সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর মেরাজকে উত্তম স্বপ্ন মনে করতেন। আবার কেউ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মূলত তাদেরকেও সত্যের মাপকাঠি মনে করা হলে তাদের কথা ও কাজ আমাদের বিশ্বাস ও আমল করা উচিত। এখানে বলা যায় সাহাবীগণের যেসব কাজ নবী (সা.) ও কোরআনের নির্দেশিত পথের সাথে মিল ছিল সেগুলোও নির্ভুল বলে বিশ্বাস করতে হবে।

আজকের যুগে আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা সাহাবী আজমাইনসহ অনেক মুরব্বী, (তাবলীগ জামায়াতের) পীর ফকিরকেও সত্যের মাপকাঠি মনে করেন। এর ফলে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দ্বীনি রীতি চালু হয়েছে। যা রাসূল (সা.) নিজে আমল করেননি এবং কাউকে আমল করতে বলেও যাননি। দ্বীনের ক্ষেত্রে এসব বিচ্ছিন্নতা অনাকাঙ্ক্ষিত ও সর্বনাশযোগ্য। এসব দিক প্রমাণ করে যে সত্যের মাপকাঠি


www.pathagar.com

একজনই থাকা প্রয়োজন। দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে সত্যের মাপকাঠির জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুকরণ করা উম্মতের জন্য জরুরি ও অবশ্য করণীয়। অর্থাৎ সত্যের মাপকাঠির জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি না মানলে গোনাহ হবে। কিন্তু অন্যদের কথা, কাজ অজিফা, তরিকা ইত্যাদি জরুরি হিসেবে আমল করা বেদ'আত ও গুনাহ। তবে অন্যদের উপদেশ গ্রহণযোগ্য হবে তখনি যদি সেগুলো রাসূল (সা.) তথা সত্যের মাপকাঠির জীবন ব্যবস্থার আদেশ উপদেশ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে অন্যদের রাসূল (সা.)-এর জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি মানুষকে শিক্ষা দেয়াই তার দায়িত্ব। এ অর্থে কেউ তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা ঠিক হবে না। কিংবা নিজ থেকে মনগড়া অজিফাও দিতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশের এক কেজি পাথরে ১০০০ গ্রাম আছে কি না তা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করতে হলে ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে রক্ষিত সিলিন্ডারের ভরের সাথেই মিলিয়ে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কেজি পাথরটি যদি যাচাই-বাছাইয়ে নির্ভুল হয় তবে সেটি নিখুঁত বটে কিন্তু সেটিকে অনুসরণ, অনুকরণ করা যাবে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে অন্যটি যাচাই-বাছাই করা যাবে না। এভাবে বর্তমান যুগের মানুষের জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি নির্ভুল কি না তা যাচাই-বাছাই করার মূল মানদণ্ড হলো দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি। নবীজীর (সা.) জীবন পদ্ধতির মানদন্ডে যাদের জীবন পদ্ধতি যাচাই-বাছাইয়ে টিকবে তারা মূলত নিখুঁত জীবনের অধিকারী। তবে অন্যরা তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করে তাদের অনুসরণ, অনুকরণ করলে ভুল হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন পদ্ধতিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সত্যের মাপকাঠি।

আল কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীজীকে (সা.) সত্যের মাপকাঠি হিসেবেই ঘোষণা দিয়েছেন- 'এভাবে আমি তোমাদের একটি উত্তম জাতিরূপে গড়ে তুলেছি-যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা (বাস্তব নমুনা) হতে পার এবং রাসূল (সা.) যেন তোমাদের সত্যের জন্যে সাক্ষ্য ও নমুনা হন।' (আল বাকারাহ-১৪৩)

'আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষীরূপে। যেমন সাক্ষীরূপে রাসূল পাঠিয়ে ছিলাম ফেরাউনের প্রতি।' (মুজাম্মিল-১৫)

'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যে সব কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর-৭)

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) খাতেমুন নাবীঈন বা শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। এটাই সত্য। এ নিয়ে কোন বির্তকও চলে না। কিন্তু কাদিয়ানীরা এটা মানতে রাজি নয়। তারা বিভিন্ন খুড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে পৃথিবীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাদেরকে মদদ দিচ্ছে ইহুদী, খৃষ্টান নাসারাগণ। এদের বিভ্রান্তী থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে রাসূল (সা.) যে শেষ নবী তার কয়েকটি অকাট্য যুক্তি তুলে ধরছি।


www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চলার পথ বা জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন। এটাকেই বলা হয় দ্বীন বা ধর্ম। যুগে যুগে ইসলামই হলো আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানুষের জন্য দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। পাক কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- 'আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।' (আল-মায়েদা-৩)

একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে তার কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে নতুন করে সেটি ভেঙ্গে তৈরি করার যেমন প্রয়োজন পড়ে না তেমনি দ্বীন পূর্ণাঙ্গ লাভ করায় তার জন্য নতুন করে আবার নবী পাঠানোর কোন যুক্তি নেই। এ ক্ষেত্রে প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকার জন্য যেমন একদল দক্ষ লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন পড়ে তেমনি দ্বীনের হেফাজতের জন্যও একদল দক্ষ আলেমে দ্বীন প্রয়োজন। এই শ্রেণীর দক্ষ আলেমে দ্বীনগণ বাতেল, কুসংস্কার ও বেদ'আত পৃথক করার মতো ক্ষমতাবান হতে হবে। তাহলে এরাই দ্বীনের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। এ শ্রেণীর আলেমে দ্বীন যুগে যুগে আছেন এবং থাকবেন। সুতরাং নতুন করে নবী পাঠানোর আর কোন যুক্তিকতা থাকতে পারে না। তাই মুহাম্মদ (সা.)-কেই আল্লাহ শেষ নবী করে পাঠিয়েছেন।

রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী করে পাঠানোর আর একটি যুক্তি হলো আল্লাহর প্রেরীত কিতাব আল কোরআনের সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) আসার আগে আল্লাহ যতগুলো কিতাব পাঠিয়েছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ধারাবাহিকতার মজবুত ব্যবস্থাপনা না থাকায় সেগুলোতে কুসংস্কার ও ভেজাল ঢুকে পড়েছিল। তাই আহলে কিতাবের একটিও নির্ভেজাল ছিল না। এ ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রেরীত কিতাব আল কোরআনের সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো শক্ত। চৌদ্দশত বছর পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোরআনের একটি আলিফ অক্ষর কোথাও হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি কিংবা নতুন কোন কিছু ঢুকেও পড়েনি। তাই নতুন করে নবী পাঠানোর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সর্ম্পকে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি আল কোরআনের হেফাজতকারীও। মানব জাতির হেদায়েতের মূল কিতাবেই যেহেতু রক্ষিত রয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। এটা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন বলেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী করে পাঠিয়েছেন।

তৃতীয় যে যুক্তিটি নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী করে পাঠানোর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে তাহলো মানুষের মাঝে অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের প্রবণতা। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে ভালবাসে। তাই মানুষের মাঝে রয়েছে গোষ্ঠী প্রীতি ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং সামাজিক রীতি-নীতি পালনের প্রথা। এর ফলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কার, রীতি-নীতি,


www.pathagar.com

বাপ-দাদার ধর্ম বলে ছাড়তে চায় না। ফলে দ্বীনে হকের সাথে বাতেলের দ্বন্দ্ব বেধেই আছে। এ কারণে নবী মুহাম্মদ (সা.) মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছানো হলেও অনেকেই বাপ-দাদার কুসংস্কারছন্ন ধর্ম পালন করে যাচ্ছে। মানুষের মাঝে এই প্রবণতা না থাকলে পৃথিবীতে ইসলামই হতো একমাত্র ধর্ম। বর্তমানে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান নামধারী অনেকেই পীরপূজারী, মাজারপূজারী, ধর্মনিপেক্ষতাবাদী ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদী রয়েছেন। তাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তারা মানতে রাজি নয়। এদেরকে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝানো হলেও তারা অবজ্ঞা করে চলে। এদের অবস্থা দেখে বুঝা যায় কোরআন বুঝানোর জন্য যদি নতুন নবীও পাঠানো হয় তবু তারা বুঝতে চাইবে না। মূলত মানুষকে যতই হক কথা বুঝানো হয় না কেন, তারা সহজে জাহেলিয়াত ত্যাগ করে না। ফলে যখনি নতুন নবী পাঠানো হয়েছে তখনি পূর্বের ধর্মবাদীরা নতুন নবীর বিরোধিতা করেছে এবং অনেককে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আল্লাহ বলেন- 'লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল; এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল, তা ছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, তা তারা অতিক্রম করে ছিল।' (আল বাকারা-৬১)

এসব কারণেই মূলত মানুষকে একটি মাত্র ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় নবী আসার দরজা বন্ধ করে দেয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। এসব কিছুর প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই হয়ত বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী করে পাঠিয়েছেন। বাকি আল্লাহই ভাল জানেন। সে আলোকেই বলছি, আমার ক্ষুদ্র চিন্তাই শেষ কথা নয়।

## ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা কেন ?

যাদের মধ্যে বিরোধিতা তাদের কর্মকাণ্ড, চরিত্র ইত্যাদি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যখন কারও কায়েমী স্বার্থে আঘাত আসে তখন সে অন্যের বিরোধিতা করে। অপরদিকে মতের অমিল হলেও একে অন্যের বিরোধিতা করে। আবার কেউ কেউ বিরোধিতায় যায় ন্যায়ের খাতিরে অন্যায়কে প্রতিহত করে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখানে কায়েমী স্বার্থের প্রশ্ন থাকে না। এ ক্ষেত্রে হকপন্থী লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য অন্যায়ের বিরোধিতা করে থাকে। কারণ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বিরোধিতা করা ঈমানের দাবী। এ দাবী পূরণ করার জন্যই হকপন্থীগণ অন্যায়ের বিরোধিতা করে। এমন একদল লোক যদি সর্বদাই পৃথিবীতে বসবাস না করে, তবে দুনিয়া জাহিলিয়াতের নরককূপে পরিণত হয়ে যাবে। তখন ন্যায় অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকবে না। এ অবস্থায় হকপন্থীগণ যখন সৎকাজে


www.pathagar.com

আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে তখন অসৎকাজ যারা করে তারা হকপন্থীদের বিরোধিতা করে। মূলত অসৎকাজ বিস্তার লাভ করে রাষ্ট্রীয় নীতির উপরে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় অসৎকাজ বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ যখন অসৎ চরিত্রের হয় তখন তারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অসৎকাজে নিষেধ করে না। এ ক্ষেত্রে বরং যে সব হকপন্থী লোক অসৎকাজে বাধা দেয় উল্টো রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ দুঃশ্চরিত্রের লোকদের সাথে মিলে হকপন্থীদের বিরোধিতা করে। তাই দেখা দরকার কে কার বিরোধিতা করছে। এদের মধ্যে কার চরিত্র কেমন, সেটা দেখাই মুখ্য বিষয়। যদি দেখা যায় অসৎ চরিত্রের লোকগণ (যারা সুদ, ঘুষ, যিনা, জুয়া, মদ, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবিসহ আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে বা বিরোধিতাকারীদের সমর্থন করে) কারও বিরোধিতা করে তবে ধরে নিতে হবে তিনি অবশ্যই হকপন্থী। কারণ হকপন্থীদের কাজে বাতেল বাধা দিবে এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। অতীতে নবী-রাসূলগণও তাদের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। মূলত কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর মধ্যে ৪ শ্রেণীর লোক হকপন্থীদের বাধা দেয়। এরা হলো- ১। অসৎ চরিত্রের লোক ২। রাষ্ট্রীয় অসৎ নীতি নির্ধারকগণ ৩। বিশেষ সৎ চরিত্রের লোক ৪। প্রচলিত ভ্রান্ত রসম রেওয়াজ ও আকিদায় বিশ্বাসীর দল।

এ ৪ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অসৎ চরিত্রের লোকদের মাঝে যে সব দোষগুণ থাকে তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর রাষ্ট্রীয় অসৎ নীতি নির্ধারকগণ অসৎচরিত্রের লোকদের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। তাই তাদের চরিত্রও অসৎ চরিত্রেরই থাকে। এবার দেখা যাক বিশেষ সৎচরিত্রের লোক কারা। এরা এমনি একটি শ্রেণীর লোক যাদের দেখে অবমূল্যায়ন করার কোন উপায় নেই। তাদের আখলাক, পোশাক পরিচ্ছদ কথাবার্তা ইত্যাদি সৎচরিত্রের। এরা সুদ, ঘুষ, যিনা, মদ, ব্যভিচার, জুয়া, হাউজি, খুন-খারাবি ইত্যাদি কোনটিতেই যায় না। তবে তাদের মধ্যে নবীআনা কাজের একটি মূল বিষয় উহ্য থাকে। তাহলো দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। অর্থাৎ তারা দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে না। তারা কখনো জামায়াতবদ্ধ হয়ে অসৎকাজে নিষেধ করে না। বরং তারা অসৎ চরিত্রের লোকদের নিকট থেকে মানত, হাদিয়া, সদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদি গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তারা-'দানকারীদের মাতা-পিতা বইস্যা আছেন কবরে.....নুরের টুপি পরাইবেন কাল হাশরে।' এসব সুন্দর সুন্দর গজল পড়ে অসৎ চরিত্রের লোকদের উদ্বুদ্ধ করে। সারা জীবন অসৎকাজে নিমজ্জিত থেকে সস্তা কয়েক টাকা দান করে যদি নূরের টুপি পাওয়া যায় তাহলে কে চাইবে অসৎকাজ ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াকে সহজে যথেচ্ছা ভোগ করার থেকে পিছিয়ে থাকতে? বিশেষ সৎচরিত্রের লোকেরা সস্তা 'নূরের টুপি' বিক্রি করে বলে তারা অসৎ চরিত্রের লোকদের অসৎকাজে নিষেধ করতে পারে না। কারণ তারা নিজেরা অসৎ চরিত্রের লোকদের থেকে দান-খয়রাত গ্রহণ করে। অপরদিকে অসৎ লোকেরা সস্তা নূরের টুপি কিনতে পারে বলে তারাও অসৎকাজ ত্যাগ করে


www.pathagar.com

না। এখানে দেখা যায় বিশেষ সৎচরিত্রের লোকেরা পরোক্ষভাবে হলেও অসৎ লোকদের উপর নির্ভরশীল। তাই বিশেষ সৎ চরিত্রের লোকেরা চিন্তা করে হক প্রতিষ্ঠা হলে অসৎ চরিত্রের লোক থাকবে না এতে তাদের নজরানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য অসৎ চরিত্রের লোকদের পাশাপাশি বিশেষ সৎ চরিত্রের (রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম ব্যবসায়ী) লোকেরাও হকপন্থীদের বিরোধিতা করে। ইতিহাস থেকেও এ কথার সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মহানবী (সা.) যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন যারা ইহুদী খৃস্টানদের পুরোহিত বা আলেম ছিলেন তারা নবীজীকে (সা.) সত্য জেনেও তাঁর বিরোধিতা করেছেন। নবীজীর (সা.) ধারণা ছিল এরাই হয়ত প্রথম দ্বীন ইসলমের দাওয়াত কবুল করবেন। কিন্তু তারা তা না করে উল্টো নবীজীর (সা.) বিরোধিতা করেছে। এ শ্রেণীর পুরোহিত সে সময় পানিপড়া, তাবিজ, কবজ, মানত হাদিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মের নামে সমাজকে শোষণ করতো বলে তারাও নবীজীকে (সা.) সত্য জেনেও তাঁর বিরোধিতা করে ছিল।

বর্তমানেও দেখা যায় দ্বীনে হকের দাওয়াত যারা দিচ্ছেন তাদেরকে বিশেষ সৎ চরিত্রের লোকসহ কায়েমী স্বার্থবাদী অসৎ চরিত্রের লোকগণ একযোগে চরমভাবে বিরোধিতা করছে। এদের বিরোধিতার মাধ্যমে যারা হকপন্থী দলের সন্ধান করছেন তাদের পক্ষে সে দলের সন্ধান পাওয়া সহজ হয়েছে। ৪র্থ আর একটি দল আছে যারা দ্বীনে হকের বিরোধিতা করে। এরা জাহিলিয়াতের প্রচলিত রীতি-নীতি যা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অংগনে চালু ছিল তা আঁকড়ে ধরে রাখে। রাসূল (সা.) এগুলো উৎখাত করে দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়েই দুনিয়ায় এসে ছিলেন। কিন্তু অনেকেই জাহিলিয়াতের প্রচলিত প্রথা বাপ-দাদার ধর্ম বলে ছাড়তে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তারা তখন হকের বিরোধিতা শুরু করে। বর্তমানেও এ শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা করছে।

বর্তমান জামানায় দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। এ কাজটা খুব কঠিন। কারও একার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। ফলে ইসলামবিদগণ জামায়াত বা দলবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন। কারণ বাতেলপন্থী তাগুতি শক্তির লোকেরা দলবদ্ধ হয়েই হকের বিরোধিতা করছে। তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একত্রে হামলা করছে। প্রয়োজনে তারা হকের দাওয়াতকারীদের হত্যা করছে। ইতিমধ্যে এ যাবৎ অনেকেই শহীদ হয়েছেন। তন্মধ্যে মিশরের হাসানুল বান্না, শহীদ কুতুবের মতো বড় বড় অনেক নেতাও রয়েছেন। এশিয়া মহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী (রহ) ইসলামী আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি যে মিশন নিয়ে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছিলেন এখানে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বলতে কিছুই ছিল না। নবীআনা কাজের দায়িত্ব পালনই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। তাই যুগে যুগে নবীআনা কাজের যারা উত্তরসূরি হবেন তাদের বিরোধিতা উল্লেখিত চার শ্রেণীর লোকগণ যে করবে এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত


www.pathagar.com

নিয়ম। এ ধারাবাহিকতায় মাওলানা মওদুদী (রহ)ও এ ধরনের ৪ শ্রেণীর লোকের বিরোধিতার শিকার। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের আলেমে দ্বীন বলে খ্যাত কিছু লোক আছেন তারা মাওলানা মওদুদীসহ জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করে থাকেন। এদের বিরোধিতার প্রধান কারণ হলো তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবিদ। তারা রাজনীতিকে ধর্মের অংশ মনে করেন না। কিন্তু মাওলানা মওদুদীর (রহ) অভিমত হল রাজনীতিসহ পুরাজীবন ব্যবস্থাই ধর্মের অংশ। ধর্মের থেকে রাজনীতি আলাদা করা কুফুরী। এটা মাওলানা মওদুদীর নিজের কথা নয়। এটা কোরআনের কথা বা ইসলামী বিধানের কথা। এখানে আলেমে দ্বীন বলে খ্যাত কিছু সংখ্যক ধর্মবিদদের চিন্তার সাথে মাওলানা মওদুদী (রহ) চিন্তার অমিল দেখা দেয়। ফলে এই শ্রেণীর (রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবিদ) লোকগণ মাওলানা মওদুদীসহ জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করে আসছে। অথচ তারা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে কুফুরীতে লিপ্ত আছেন। এদের সাথে আরও একটি বিষয়ে মাওলানা মওদুদী (রহ) মতের অমিল ছিল। সেটি হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব। মাওলানা মওদুদী (রহ) কোরআনের আলোকে হিন্দু ও মুসলমানকে দু'টি জাতি মনে করতেন। সে হিসেবে মওদুদী ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার সময় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দু'টি রাষ্ট্র হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তখন দেওবন্দী কিছু মাওলানা হিন্দু, মুসলিম একজাতি হিসেবে মত প্রকাশ করে একটি রাষ্ট্রের অভিমত ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত মাওলানা মওদুদী (রহ) দ্বিজাতিতত্ত্বের অভিমত বিজয় লাভ করে এবং ভারতবর্ষ দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এতে করে একজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী আলেমে দ্বীন বলে খ্যাত (সেক্যুলার ধর্মবিদ) লোকগণ মাওলানা মওদুদী (রহ) বিরোধিতা শুরু করে দেন। তখন থেকেই তাদের উত্তরসূরিগণ মাওলানা মওদুদী (রহ) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করে আসছে। তাদের জানা উচিত আজ যদি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ভারতের অংশ হত তবে এই দুই দেশের লোকদেরও কাশ্মীরের মতো ভাগ্যবরণ করতে হত। আল্লাহর রহমত মাওলানা মওদুদীর (রহ) মতো বিচক্ষণ লোক থাকায় আমরা সে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছি। এভাবেই যুগে যুগে তাগুতি শক্তি দ্বীনে হকের আন্দোলনের বা নবীআনা কাজের বিরোধিতা করছে। কিন্তু সেক্যুলার ধর্মবিদদের কাজে অসৎ লোক ও ধর্মব্যবসায়ী মহলের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের কাজ যদি একশত ভাগ হক হতো তাহলে তাগুতি শক্তি অবশ্যই বাধা দিত। যেহেতু তাদের কোন বিরোধিতা নেই সুতরাং ধরে নিতে হবে তাদের কাজ নবীআনা কাজের পন্থায় হচ্ছে না। কিন্তু এটাকে নবীআনা কাজ মনে করে অনেক সহজ সরল মানুষ জিন্দেগী উজাড় করে দিচ্ছেন। তারা এর বাইরে ইসলামের আরও কাজ আছে তা মানতেই চান না। এটা অবশ্যই ক্ষতির ব্যাপার। তাই আমি ধারণা করছি এ বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে জনগণকে অবহিত করা দরকার। এটিই হলো রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ। এরাও পরোক্ষভাবে নবীআনা কাজের বিরোধিতাকারী। মূলত নবীআনা কাজের বিরোধিতা হলো হক আর বাতিলের দ্বন্দ্ব। এটা আজীবন থাকবেই।


www.pathagar.com

## নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতি

নবী-রাসূলগণ মেয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের জীবন পদ্ধতি উম্মতের জন্য অনুসরণ করা ফরজ। কারণ তাদের জীবন পদ্ধতি ছিল নির্ভুল মাপকাঠি এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মনোনীত। এ ক্ষেত্রে নতুন নবী-রাসূল আসার আগ পর্যন্ত পূর্বের নবীর দ্বীনের অনুসরণ করাই বৈধ। কিন্তু যখনি আল্লাহ তায়ালা নতুন করে নবী পাঠানোর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন তখনি পূর্বের নবীর জীবন পদ্ধতি ও কিতাব মুলতবি করে পৃথিবীতে নতুন নবী পাঠান এবং তাঁর জীবন পদ্ধতি ও কিতাব অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। কারণ পূর্বের কিতাব ও নবীর জীবন পদ্ধতি তখন আর নির্ভুল থাকে না। এ জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী করে পাঠানোর পর থেকে তাঁর জীবন পদ্ধতি, তাঁর কাছে প্রেরিত কিতাব উম্মতের জন্য অনুসরণ করা বৈধ ও একমাত্র হুকুম।

আল্লাহ বলেন-'হে নবী। আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং খোদার নির্দেশে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' (সূরা আহযাব ৪৫-৪৬)

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্য করল, সে অবশ্যই আল্লাহতা'য়ালার ফরমাশদারী করল।' (নিস-৮০)

নবী-রাসূলগণের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনে হককে বিজয়ী করা। অর্থাৎ একটা বাতেল রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ প্রদত্ত রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করে সেখানে নতুন একটা সহি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা খুবি কঠিন ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কে বাসা বাধা জাহিলিয়াতের রীতি-নীতি অপসারণ করে খোদায়ী বিধানের নিয়ম পদ্ধতি ঐ মন ও মস্তিষ্কে ঢুকাতে হয়। এ জন্য এ কাজটা নিসন্দেহে খুবই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এমন একটা কঠিন কাজ সুশৃঙ্খল নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন- '(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত কর, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। আর তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব মেহেরবান।' (আলে ইমরান-৩১)

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী কাজের প্রথম সহায়ক পদ্ধতি হলো দাওয়াত কবুল করার পূর্বেই জাহিলিয়াতের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি মন ও মস্তিষ্ক থেকে অপসারণ করানো তারপর ঐ খালি জায়গা পূরণ করাতেন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ বিশ্বাস দিয়ে। আমাদের দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতিই শুধু এমন ছিল না, যুগে যুগে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই একই পদ্ধতিতে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের আহবানের প্রথম ঘোষণা আল কোরআনে উদ্ধৃত আছে। যেমন-


www.pathagar.com

'আমি নূহ (আঃ)-কে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ বা প্রভু নেই।' (আল আরাফ-৫৯)

'এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।' (আল আরাফ-৬৫)

'এবং ছামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' (আল আরাফ-৭৩)

এভাবে গায়রুল্লাহর দাসত্ব ও রীতি-নীতি অস্বীকার করার পর সত্যের মাপকাঠি ও আদর্শ নেতা হিসেবে (অনুকরণ ও অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ নেতা) নবী-রাসূলগণকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য আহবান জানাতেন। এদু'টি আহবান একত্র করে যে ঘোষণা দেয়া হতো, সেটিই হলো কালেমা তাইয়্যেবা। যেমন আমাদের দ্বীনের নবীর এ দাওয়াত যারা কবুল করতেন তাদেরকে বলতে হতো-আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।'

অর্থাৎ জাহিলিয়াতের সকল বিশ্বাস ও রীতি-নীতি যে মন ও মস্তিষ্ক দখল করে রেখে ছিল, তা খালি করে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ (হুকুমদাতা) ও তাঁর রাসূল (সা.) একমাত্র আর্দশ নেতা, এ বিশ্বাস দিয়ে ঐ খালি জায়গা পূরণ করাতেন। তাই সকল নবীগণ দাওয়াত দিতেন- হে দেশবাসী, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন হুকুমকর্তা নেই। (সূরা আরাফ)

গোদাম-ঘর খালি না করে যেমন নতুন ফসল গোদামে রাখা যায় না তেমনি জাহিলিয়াতের ভ্রান্ত বিশ্বাস, জীবন পদ্ধতির রীতি-নীতি অপসারণ না করে খোদায়ী বিধানের বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি সেখানে ঢুকানো সম্ভব নয়। খারাপ দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ছোঁয়াচে মালামাল যে ঘরে থাকে সেখানে যদি উত্তম সুগন্ধিময় জ্যোতিপূর্ণ মালও রাখা হয় তবু সেটিতে খারাপের সক্রমণ ঘটতে পারে বা ঘটা স্বাভাবিক। এ কারণে জাহিলিয়াতের বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি মন ও মস্তিষ্কে রেখে সেখানে যদি চাপাচাপি করে খোদায়ী বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ঢুকানো হয় তবে উভয়ের মিশ্রতায় সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুনাফিকিই প্রকাশ পায়। কারণ শয়তান বিভিন্ন উপায় উপকরণ দিয়ে আক্রমণ করে খোদায়ী বিশ্বাসকে নড়বড় করে দেয়। সেজন্য বাতেল বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি মন ও মস্তিষ্ক থেকে চিরদিনের জন্য অপসারণ করে সেখানে নতুন সহি বিশ্বাস ও নিয়ম নীতি ঢুকাতে হয়। তারপর সে অনুযায়ী আমল করতে হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতেন তখন তাঁরা ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল বাতেল বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি অস্বীকার করে খোদায়ী বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি গ্রহণ করার আহবান জানাতেন। এর ফলে রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে সমাজে ছোট, বড় নেতা ও বাতেল আকিদায় বিশ্বাসী ধর্মীয় ব্যক্তিগণ


www.pathagar.com

একযুগে নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করত। কিন্তু নবীগণ এদের বিরোধিতার কোন তোয়াক্কা করতেন না। বরং এদের বিরোধিতা জেনেও আল্লাহ প্রদত্ত দাওয়াতি পদ্ধতিতেই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী-রাসূলগণ ইচ্ছা করলে বিরোধিতা এড়ানোর জন্য বাতেল বিধি-বিধানকে অস্বীকার না করেও নতুন সহি জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিতে পারতেন। কিন্তু এভাবে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি আল্লাহতা'য়ালা নবী-রাসূলগণকে শেখাননি বলে তাঁরা বাতেলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে দ্বীনে হকের দাওয়াত দেননি। কারণ এভাবে দাওয়াত দেয়াতে কোন সুফল বয়ে আনে না বরং দ্বীনে হকের ক্ষেত্রে ক্ষতিই হয় বেশি। আল্লাহ বলেন- 'হে ঈমনদারগণ। নিজেদের পিতৃগণ এবং ভ্রাতৃগণকে (নিজেদের) বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তারা কুফরীকে প্রিয় মনে করে ঈমানের তুলনায়; আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করে বস্তুত এরূপ লোক বড়ই নাফরমান! (আত্ তাওবাহ আয়াত-২৩)। ইসলামের ক্ষেত্রে বাতেল চিন্তা ও বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় রীতি-নীতি মন ও মস্তিষ্কে রেখে ঐ জাগায় নতুন সহি বিশ্বাস ও তার কর্মপদ্ধতি এবং রীতি-নীতি একত্রে সেখানেই স্থান দেয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতি হলো প্রথমে তাগুত ও জাহিলিয়াতের রীতি-নীতি অস্বীকার করার দাওয়াত প্রদান। তারপর দ্বীন ইসলাম কবুল করার আহবান জানানো।

কোরআনের ভাষায় নবীগণের ঘোষণা হলো- 'আমরা তোমাদের ও তোমাদের সেই মা'বুদদের বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, সব দায়িত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হলাম। আমরা তোমাদের সব কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করলাম এবং এই মুহূর্ত হতে আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্টভাবে শুরু হয়ে গেল চিরদিনের তরে। যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ও তাঁরই অনুগত না হবে ততদিন পর্যন্তই তা স্থায়ী থাকবে।' (সূরা মুমতাহিনা-৪)

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই মন ও মস্তিষ্কের চিন্তা-চেতনা থেকে জাহিলিয়াতকে সরাতে হবে। তারপর তাওহীদি চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এখানে জাহিলিয়াত হলো মানব রচিত মতামত চিন্তা-চেতনা, রীতি-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, বিধি-বিধান, সামাজিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথা ও রীতি-নীতি ইত্যাদি। জাহিলিয়াতের এ সব উপাদান সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পর্যায়ে অনুসরণ ও অনুকরণ হয়ে থাকে। অপরদিকে তাওহীদ হলো- আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ইলাহ অর্থাৎ হুকুমকর্তা মেনে চলা এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী সবার হুকুম, রীতি-নীতি, প্রথা, রসম-রেওয়াজ আদর্শ অমান্য করা এবং অনুসরণ ও অনুকরণ না করা। প্রকাশ থাকে যে, আরবের কাফের মুশরিকগণ ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করেছিল এ জন্য যে, তারা মনে করত মুহাম্মদ (সা.) তাদের বাপ-দাদার প্রথা, রীতি-নীতি ও ধর্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এবং


www.pathagar.com

মুহাম্মদ (সা.) যে ধর্ম প্রচার করছে তা আদৌ ঠিক নয় (নাউযুবিল্লাহ) বরং তাদের ধর্মই ঠিক এবং এতেই কল্যাণ নিহীত। তারা আল্লাহকে স্বীকার করত এবং কাবা ঘর আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করত। তাই বদর যুদ্ধে কাফের মুশরিকরা কাবা গৃহের দেয়াল বা গিলাফ স্পর্শ করে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করে বলেছিল- হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ তোমার ধর্ম ছেড়ে নতুন ফেতনা সৃষ্টি করছে। আমরা তাকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি। আমরা সঠিক পথে থাকলে আমাদের বিজয় দিও। এতে বুঝা যায় যে, কাফের মুশরিকরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত ঠিকই কিন্তু বাপদাদার রীতি প্রথা বা রসম-রেওয়াজ ইত্যাদির মধ্যে কল্যাণ নিহীত আছে বলে বিশ্বাস করত। এগুলো তারা ত্যাগ করতে অনীহা প্রকাশ করত। তাই নবীআনা দাওয়াতের পদ্ধতিতে আল্লাহকে ইলাহ মানার পাশাপাশি বাপদাদার রসম-রেওয়াজকেও অস্বীকার করার আহবান জানানো হত। এ পর্যায়ে যারা তাওহীদের বাণী কবুল করত, তাদের উপর তখন নতুন দায়িত্ব অর্পিত হত। অর্থাৎ তাদেরও অন্যদের কাছে নবীআনা পদ্ধতিতে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করতে হত। সেজন্য মুসলমান হলেই দ্বীনে হকের কাজ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এতে নিজেদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায় ও আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ বলেন- 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, সৎকাজে আদেশ দেবে, অসৎকাজে বাধা দেবে, তারাই সফলকাম।' (আলে-ইমরান-১০)

যুগে যুগে একদল লোক দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়ে যাবে, কখনো আল্লাহ এ জমীন দাওয়াত শূন্য রাখবেন না। এটাই আল্লাহর বিধান। পাশাপাশি কিছু লোক তাগুতের পথে মানুষকে আহবান জানাবে। এতে করে তাগুত ও দ্বীনে বাতেলের সাথে হকপন্থীদের সংগ্রাম-যুদ্ধ হবে, এটাই নিয়ম। অর্থাৎ দাওয়াত যদি হক হয় তবে দ্বীনে বাতেল হকপন্থীদের কাজে বাধা দিবেই। এ সময় ধৈর্য্য ধরে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নবীআনা পদ্ধতির বাইরে বিকল্প কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়া যাবে না।

আল্লাহ বলেন- 'যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।' (আন নিসা-৭৬)

ঈমান আনার পর মুসলমানদেরকে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। যারা ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তারাই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। নিজেদের জান ও মালের প্রতি মহব্বত করে তাগুতি শক্তির সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখলে নিজেদের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। মূলত তাগুত ও জাহিলিয়াতের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ, আইন-কানুন নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মে রেখে, সেখানেই নতুন, একটা সহি বিশ্বাস ও তার নিয়ম পদ্ধতি ঢুকিয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ করা দ্বীনে হকের দাওয়াতী পদ্ধতিতে চরমভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। মক্কী যুগে মুহাম্মদ (সা.) যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন কুরাইশদের


www.pathagar.com

মুশরিক ও কাফেররা চরম বিরোধিতা শুরু করেছিল। কিন্তু এতো বিরোধিতার পরও নবী মুহাম্মদ (সা.) যখন তাদের সাথে কোন প্রকার আপোস করেনি তখন মুশরিকরা আপোসের বিভিন্ন ফরমুলা নিয়ে নবীজীর কাছে আসে। তারা নবীজীকে ধন-সম্পদ ও সুন্দরী মেয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বলেছিল হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি আমাদের উপাস্যদের নিন্দা বলা থেকে বিরত থাকলে আপনাকে আপনার আকাঙ্ক্ষায় যা চায় তাই দেয়া হবে। তারপর তারা আরও বলেছিল আপনি এক বছর আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং আমরা এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদত করব। কাফের মুশরিকদের এ প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্য হলো সংঘাত সংঘর্ষ এড়ানো এবং তাদের বাপদাদার মনগড়া উপাস্যদের রক্ষা করা ও মানব রচিত আইন ও রীতি-নীতি বহাল রাখা। সেদিনের এ প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ্ রাসূলের মাধ্যমে আল কোরআনের এক সূরা নাযিল করে তার জবাব দিয়ে ছিলেন। ঐহিহাসিক এ সূরাটির নাম সূরা আল কাফিরুন।

এটিতে আল্লাহ্ বলেন- বলে দাও, হে কাফেররা। আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো। আর না তোমরা তার ইবাদত করো যার ইবাদত আমি করি। আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমাদের জন্য।

এ সূরার মাধ্যমে এ কথাই বুঝা যায় যে কোন অবস্থাতেই মানব রচিত মতবাদ ও আল্লাহর দ্বীন একত্রে অনুসরণ, অনুকরণ করা যাবে না। এবং তাগুতের সাথে কোন আপোসও করা যাবে না। রাসূল (সা.) এ ধরনের বিপ্লবী দাওয়াত দিতেন বলেই তাগুতি শক্তি রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করত। তাঁরা যদি প্রচলিত তাগুতি শক্তির আইন কানুন ও জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতি, রসম-রেওয়াজ, ধর্মের নামে বাতেল আকিদা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে অস্বীকার না করে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতেন তবে কাফের সরদারসহ তৎকালীন রাজা-বাদশাহরা তাঁর বিরোধিতা না করে মাথার তাজ হিসেবে তুলে রাখতেন। কিন্তু এটা দ্বীনে হকের দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয় বিধায় নবী-রাসূলগণ এ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। এ পর্যায়ে একটা কথা বলতে হয় যা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে তাবলীগ জামায়াত, কিছু পীর, ফকির এবং রাজনীতি নিরপেক্ষ ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন একটা কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যেখানে এগুলোকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ তারা দ্বীনের খণ্ডিত কিছু আচার-অনুষ্ঠানের (নামাজ, রোজা, হজ্জ) মধ্যে তাদের দাওয়াত সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এর ফলে তাদের দলে যারা নাম লেখান তারা দ্বীনে হকের আংশিক কিছু বিধান পালন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বীনে বাতেলের নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। যেমন তারা রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদিতে রাজার মনগড়া আইনকেই অনুসরণ করেন। দেখা যায় যারা ধর্ম


www.pathagar.com

নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী এবং যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী নয় তারা তাবলীগের দাওয়াত গ্রহণ করে তিন চিল্লা দিয়ে এসেও বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন করেন না। তফাৎ এতটুকুই হয় যেমন আগে টুপি দাড়ী না নিয়ে আল্লাহর আইন ঠেকানোর মিছিলে যেত এবার চিল্লা দিয়ে এসে দাড়ি-টুপি ও লম্বা পাঞ্জাবী লাগিয়ে মুছল্লি সেজে আল্লাহর আইন ঠেকানোর মিছিলে যায়। আবার মসজিদে ঢুকে বলে ধর্ম সর্ম্পকে আমরা কি কম বুঝি মসজিদ কোন রাজনীতির জায়গা না, এখানে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না। পরিবর্তন এতটুকুই হয়। এ ধরনের পরিবর্তনে দ্বীনে হকের ক্ষতি আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়। কারণ তাবলীগ জামায়াতকে নাজাতের পথ হিসেবে গ্রহণ করে সেখান থেকে এসে যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে এবং কোরআনের আইন ঠেকানোর মিছিলে অংশগ্রহণ করতে কোন বাধা থাকে না তখন সাধারণ পাবলিক মনে করে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা জিনিস। ধর্মের কাজ ধর্মে করবে আর রাজনীতির কাজ রাজনীতি করবে। এ যুগে কোরআনের আইন দিয়ে দেশ চললে তাবলীগ জামায়াত অবশ্যই মানব রচিত আইন ও বিধি বিধানকে অস্বীকার করত। যেহেতু তারা নবীআনা কাজ (তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বলে। তবে এটা নবীআনা কাজের দাওয়াতী পদ্ধতি নয়) করেও মানব রচিত আইন, রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ ইত্যাদিকে অস্বীকার করে না সুতরাং এর চেয়ে নাজাতের পথ আর কি হতে পারে? এতে তাগুতি শক্তির বিরোধিতা, গালি-মন্দ কিছুই শুনতে হয় না। প্রয়োজনে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মূলত তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াতী পদ্ধতির এটাই হলো বড় সমস্যা। তারা দ্বীন ইসলামের নামে এমন একটা রসম-রেওয়াজ চালু করছেন যা নবী-রাসূলগণের দ্বীনে হকের দাওয়াতের কোন পদ্ধতি ছিল না। এতে করে সাধারণ মানুষ দ্বীনে হককে বিজয়ী করার আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সাথে সাথে ঈমানী চেতনা ও জেহাদী স্পৃহা এবং শহীদি আকাঙ্ক্ষা সবই হারিয়ে ফেলছে। ঈমান এমনি এক চেতনা যেখানে বাতেল প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই। পাশাপশি বাতেল কর্মকাণ্ড দেখলে তার হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠে। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লা দিয়ে এসেও সেক্যুলার রাজনৈতিক বিশ্বাস (বাতেল আকিদা) তাদের মন ও মস্তিষ্কে বাসা বেধে থাকে। পাশাপশি প্রতিকৃতিতে মালা দেয়া, ফুল দেয়া, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সভা, সমিতির কাজকর্ম উদ্বোধন করা, সুদি ব্যবসায় শরিক হওয়া, রবীন্দ্র সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়া ইত্যাদি সবি চালিয়ে যায়। অথচ কারও যদি জাররা পরিমাণ ঈমান থাকে তবু সে এগুলোতে বিশ্বাস রাখা ও এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে যাবে না। অপরদিকে তাদের দাওয়াতী পদ্ধতির বড় ভুল হলো তারা তাগুতকে ভয় করে এবং তাগুতের আইন, রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ মন ও মস্তিষ্ক থেকে না সরিয়েই সেখানে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের আংশিক কিছু রীতি-নীতি ঢুকিয়ে দেয়। তারা যেহেতু পূর্বের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ, আইন-কানুন ভ্রান্ত বলে অস্বীকার করে না সেজন্য তিন চিল্লা থেকে এসেও পূর্বের বাতেল বিশ্বাস ও রীতি-


www.pathagar.com

নীতি আমল করতে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে বাতেলকে এড়িয়ে চলার জন্য এটা তাদের কৌশল বা হেকমত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহর রাসূল (সা.) যে পদ্ধতিতে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিয়েছেন আমাদেরও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় হেকমত মনে করে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা বেদ'আতী পদ্ধতি হিসেবেই গণ্য হবে। এর মাধ্যমে কোন সুফল আসবে না। অর্থাৎ এর মাধ্যমে নামাজী বৃদ্ধি হলেও দ্বীনে হকের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যায়- আমরা যদি ঢাকা যেতে চাই তবে ময়মনসিং হয়েও ঢাকা যেতে পারব আবার ভৈরব হয়েও যেতে পারব। তবে আমাদের দেখতে হবে কোন পথে যাওয়ার জন্য আমাদের বিশ্বনেতা নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে সে পথে যাওয়াই হবে বৈধ। এটা সত্যের মাপকাঠিকে অনুসরণ করার বৈধ রীতি। কিন্তু আমরা যদি যানজট, দুর্ঘটনা ইত্যাদি এড়ানোর চিন্তা করে সহজ পথে যাই, যেতে পারব। তবে এটা হবে নিজেদের মনগড়া পথ চলা। কিন্তু নিজেদের মনগড়া কৌশল দ্বীনে হকের ক্ষেত্রে বৈধ নয়। তাই নবী-রাসূলগণকে সত্যের মাপকাঠি ধরে তাদের প্রর্দশিত পথেই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ বলেন- 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা জনগণকে সুকৃতির আদেশ করবে আর দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

'বলে দিন হে মুহাম্মদ (সা.) এটাই আমার একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই।' (সূরা ইউছুফ-১০৮)

জনগণকে শুধু সুকৃতি বা সৎকাজের আদেশ দিলে চলবে না, তাদেরকে অসৎকাজেও নিষেধ করতে হবে। এ দু'টি কাজ একসাথে না করলে নবীআনা দাওয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে না। সাথে সাথে যারা খোদায়ী বিধান মানে না তাদের আনুগত্য করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা দ্বীনের ক্ষেত্রে বৈধ নয়।

আল্লাহ বলেন- 'তোমরা খোদায়ী বিধানের সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য করো না, যারা (শিরক-কুফর ইত্যাদি) অনর্থের সৃষ্টি করে আর সংশোধনের ব্যবস্থা করে না।' (শু'আরা ১৫১-১৫২)

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনে হককে বিজয়ী করা। অর্থাৎ ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। খেলাফত প্রতিষ্ঠা না করে দ্বীন ইসলামের অনেক বিধি-বিধান, আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ ইসলামী দ্বীন গ্রহণ করার সময় তাগুতের যত নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন এবং বাপদাদার রসম-রেওয়াজ অস্বীকার করা হয় তা পুরাপুরি সরাতে হলে খোদায়ী বিধানকে বিজয়ী করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ঈমান আনার পর দ্বীনে হকের আন্দোলন করা ফরজ হয়ে পড়ে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়ে গেলে দ্বীন ইসলামের হুকুম মানা জনগণের জন্য সহজ হয়। অর্থাৎ খেলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই মানুষকে দ্বীন মানার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। আল্লাহ বলেন- 'আমি যখন


www.pathagar.com

তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, ন্যায়-নীতিমূলক হুকুম জারী করে। আর নিষিদ্ধ করে দেয় অন্যায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড।' (হজ্জ-৪১)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব করলে বা ইবাদত করলে যেমন শিরক হয় তেমনি আল্লাহর আইন ছাড়া অন্যের আইন মানলেও শিরক হয়। আর নামাজ, রোজা, হজ্জ ও দান-খয়রাত-এর মতো কিছু ইবাদাত করার পাশাপাশি যদি মানব রচিত আইন ও বিধি-বিধানকে বিশ্বাস করা হয় তবুও শিরক হবে। শিরককারীর কোন ইবাদাত আল্লাহ কবুল করেন না।

আল কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- 'শিরক করলে তাদের যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীর কাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে।' (আন আম-৮৮)

এ কারণে নবী-রাসূলগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মানার দাওয়াত দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই একমাত্র আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুমকর্তা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা, জন্ম ও মৃত্যুদাতা। তাই মানব জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মানতে হবে। সে জন্য নবীআনা দাওয়াতের পদ্ধতিতে আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন- 'হে নবী। সেই সব লোক সর্ম্পকে তোমার কি ধারণা, যারা একদিকে কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে বলে মনে মনে ধারণা করে আর অপরদিকে আল্লাহদ্রোহী শক্তির নিকট বিচার ফয়সালা চায়, অথচ সেই আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার আদেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছিল? (তারা আসলে মুনাফিক) শয়তান তাদিগকে গুমরাহ করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। এ জন্য যখন তাদিগকে আল্লাহর বিধান এবং রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তুমি দেখবে যে, এ সব মুনাফিক লোক তোমার পাশ কেটে দূরে সরে যাচ্ছে।' (সূরা নিসাঃ ৬০-৬১)

নবীআনা দাওয়াতের পদ্ধতিতে আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে সুসম্পর্ক রেখে দ্বীনে হকের দাওয়াতের কোন রীতি ইসলামে নেই। এ ক্ষেত্রে চরমভাবে খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার করতে হয়। এ জন্য খোদাদ্রোহী শক্তির পক্ষ থেকে অত্যাচার, নির্যাতন, বাধা আসা স্বাভাবিক। এগুলোকে ধৈর্য্যের সাথে, সবরের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। এটা হলো ঈমানী পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই জান্নাতের আশা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন- 'তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে! অথচ এখনো আল্লাহ (পরীক্ষা করে) দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।' (আলে ইমরান-১৩৮)

'মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে- তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না।' (আল আনকাবুত ৩২)

কিন্তু খোদাদ্রোহী শক্তির অত্যাচার নির্যাতন এড়ানোর জন্য তাদের কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার না করে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হলে, এ ক্ষেত্রে মূলত কোরআনের


www.pathagar.com

আংশিক মানা হয়। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের অল্প কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান (নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব ইত্যাদি) মানার কথা বলা হয়। কিন্তু এদের মন ও মস্তিষ্কে দ্বীনে বাতেলের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি বাসা বাধা থাকে বলে কর্ম জীবনে তারা আংশিক দ্বীনে বাতেলের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে এবং আংশিক দ্বীনে হকের আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে। এভাবে জীবন চালায়ে এটাকেই তারা নাজাতের একমাত্র পথ মনে করে। কিন্তু কুরআনের কিছু অংশ মানা এবং কিছু অংশ না মানা গোটা কুরআনকেই না মানার শামিল। এরূপ আমলকারীকে দুনিয়া এবং আখেরাতে চরম লাঞ্ছিত হওয়ার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- 'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ, আর কিছু অংশের উপর ঈমান রাখ না? অতএব কি শাস্তি হতে পারে তার, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত? আর কিয়ামত দিবসে নিক্ষেপ করা হবে তাকে বড় কঠিন আযাবের মধ্যে। আর আল্লাহ তায়ালা বেখবর নহেন তোমাদের (এ সমস্ত মন্দ ও গর্হিত) কার্যকলাপ হতে।' (সূরা বাকারাহ ৮৫)

নবী-রাসূলগণকে সত্যের মাপকাঠি মানলে তাদের পদ্ধতিতেই দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। অন্যথায় এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে যেমন কোন সুফল পাওয়া যাবে না তেমনি সেটা হবে নবীআনা দাওয়াতি পদ্ধতির উল্টো রীতি। সুতরাং তাগুতকে অস্বীকার করেই দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে হবে। এবং উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা হতে হবে দ্বীনে হককে বিজয়ী করা। এতে তাগুতের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ হবে। তারা মারবে এবং নিজেরাও মরতে হবে। তবু এটাতেই রয়েছে সফলতা।

আল্লাহ বলেন- হে বিশ্বাসীগণ! এইবার আমি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের কথা বলব কি যার দ্বারা তোমরা পরকালের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে নাজাত পেতে পারবে? (তবে শোন তা হচ্ছে এই যে) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। যদি তোমরা চিন্তা করে বুঝ তাহলে বুঝবে যে এটাই তোমাদের জন্য (নাজাতের সঠিক) পথ। (সূরা-সফ ১০-১১)

'আল্লাহতা'য়ালা মুমিনদের জানও মাল সম্পদকে তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আর তারা যুদ্ধ জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা (দুশমনদেরকে) মারে ও নিজেরা মরে।' (তাওবহ ১১১)

## ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক

আল্লাহতা'য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করে জীবন চলার গাইড বুক হিসেবে দিয়েছেন আল কোরআন। আল কোরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। এ ধর্মগ্রন্থ মানুষের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ আর্ন্তজাতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ


www.pathagar.com

অর্থে ধর্ম হলো জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে বর্তমানে চলছে দুই ধরনের জীবন ব্যবস্থা। যেমন- ১। আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, ২। মানুষের মনগড়া জীবন ব্যবস্থা।

আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা মানুষের দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। এতে মানুষের মাঝে উত্তম স্বভাব বা উত্তম নীতি গড়ে উঠে। এ নীতি সকল নীতির উপর বিজয়ী হয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে নীতির রাজা বলা যায়। মানুষের মাঝে আদর্শ নীতি বা নীতির রাজা বা উত্তম নীতি যাই বলি না কেন, এ গুণ পয়দা হওয়া এমনি এমনি সম্ভব নয়। এর জন্য স্রষ্টা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু কর্মকাণ্ড ও আইন বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এর সবটুকু মিলেই হলো স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, অর্থাৎ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা আইন বিধান মিলেই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। একজন মানুষের পক্ষে কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি জীবনে এককভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব হয় না। কারণ রাষ্ট্রের এমন কিছু কর্মকাণ্ড রয়েছে যার প্রভাব ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে। এ পর্যায়ে ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের অধর্ম নীতি পরিহার করে কিংবা অধর্মনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে তবে সে রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যায়। এ জন্য ব্যক্তি এমন অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৌনতা অবলম্বন করে। অথচ মৌনতা অবলম্বন করাও এক ধরনের স্বীকৃতি। তাই ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে ধর্মের অনুসারী হয়ে স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা পালন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য ব্যক্তি নীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি মিলেই ধর্মীয় জীবন। তাই ধর্মের মূল উপাদান হলো রাজনীতি বা রাজনীতিই হলো মানুষের ধর্ম।

রাজনীতির 'রাজ' শব্দটি দিয়ে বড় বা উত্তম বুঝায় আবার রাজাও বুঝায়। যেমন রাজ হাঁস দ্বারা বড় হাঁস বুঝায় তেমনি রাজচরিত্র দ্বারা উত্তম চরিত্র বুঝায়। আবার রাজদরবার, রাজ সিংহাসনের মাধ্যমে রাজার দরবার বা রাজার সিংহাসনও বুঝায়। অতএব রাজনীতি কথাটির মাধ্যমে বড় বা উত্তম নীতি কিংবা নীতির রাজা যেমন বুঝায় তেমনি রাজার নীতিও বুঝায়। সুতরাং রাজনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। নীতির রাজা রাজনীতি ২। রাজার নীতি রাজনীতি। এ পর্যায়ে রাজনীতির যেমন দু'টি ভাগ রয়েছে তেমনি ধর্মের (জীবন ব্যবস্থা)ও দু'ভাগ রয়েছে। এর একটি হলো মানুষের তৈরি জীবন ব্যবস্থা এবং ২য় টি হলো আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা মানুষের মাঝে উত্তম নীতি গড়ে তুলে।

মানুষের মনগড়া জীবন ব্যবস্থা যেমন মানুষের তৈরি তেমনি রাজার নীতি রাজনীতিও মানুষের গড়া। এ অর্থে ধর্মই হলো রাজনীতি। অতঃপর রাজনীতির এ দু'টি শাখাকে বিশ্লেষণ করলে এর আরও কিছু শাখা প্রশাখা খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সময়ে সময়ে এগুলোকে মানুষ মুক্তির একমাত্র পথ মনে করেছে। কিন্তু মানুষ নিজেদের মনগড়া জীবন ব্যবস্থার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরেও মুক্তির লেশমাত্র খোঁজে পায়নি। তাই বুক ভরা হতাশা নিয়ে নিয়তিকে দোষারোপ করছে। কিন্তু মুক্তির জন্য যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন সেখানের মাঝ পথ জুড়ে পড়ে আছে বড় বড় জগদ্দল পাথর। এ পাথর


www.pathagar.com

প্রকাশ্য দ্বীনে বাতেল আর ছদ্মবেশী দ্বীনে বাতেল। প্রকাশ্য দ্বীনে বাতেলকে আমরা চিনতে পারলেও ছদ্মবেশী দ্বীনে বাতেলকে চিনতে পারছি না। এরা নামাজ, কালাম, পড়লেও পরোক্ষভাবে দ্বীনের ক্ষতি করছে। যেমন তারা কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করলেও রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে হয় তারা নিষ্ক্রিয় থাকে, না হয় সেক্যুলার রাজনীতি করে জীবন কাটিয়ে দেয়।

অথচ ধর্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি যেমন চলে না তেমনি রাজনীতি বাদ দিয়ে ধর্মকর্ম বলতে কিছু থাকে না। এ জন্য বলা হয়েছে ধর্মই হলো রাজনীতি বা রাজনীতিই হলো ধর্ম। কিন্তু বর্তমানে আমরা এ উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি। এ পথ খুঁজে নেয়ার এখন সময় এসেছে। আসুন আমরা নিজের তথা মানবতার কল্যাণে সে পথ খুঁজে বের করি।

মানুষের মাঝে উত্তম নীতি গড়তে হলে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহর নীতি হলো সকল নীতির রাজা। তাই আল্লাহর নীতি রাজনীতিতেই মানুষের মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে।

আল্লাহ বলেন-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামের ভেতরে প্রবেশ করো।' (বাকারাহ-২০৮)

'আর আমি আল কোরআনে যে সব কিছু নাযিল করি যা চিকিৎসার উপকরণ আর ঈমানদার লোকদের জন্য রহমত তথা শান্তির উপকরণ।' (বনি ইসরাইল ৮২)

মানুষের মনগড়া আইন বিধান হলো রাজার নীতি। এটাও এক ধরনের রাজনীতি। একেই বলা হয়েছে রাজার নীতি রাজনীতি। রাজার নীতি রাজনীতিতে কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে ধর্ম থাকে না যেমন কোথাও আংশিক ধর্ম এবং আংশিক অধর্ম থাকতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ পূর্ণাঙ্গ নাস্তিক হয় আবার কেউ আংশিক ধর্ম ও আংশিক অধর্মের রীতি অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে যারা আংশিক অধর্মে লিপ্ত থাকে তাদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানা হয় না। তাই ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক জীবন্ত দেহের মতো। প্রাণের অবর্তমানে যেমন দেহ অচল তেমনি রাজনীতিতে ধর্ম না থাকলে রাজনীতিই অচল। আবার ধর্মে রাজনীতি না থাকলে ধর্ম হয় প্রাণহীন। সে জন্য ধর্মকেই রাজনীতি এবং রাজনীতিকে ধর্ম বলা হয়েছে। ধর্মহীন রাজনীতি হলো প্রাণহীন। প্রাণহীন দেহ যেমন মানুষের কল্যাণ করতে পারে না বরং দুর্গন্ধ ছড়ায় তেমনি ধর্মহীন রাজনীতি কিংবা রাজনীতিহীন ধর্ম মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বরং অসভ্য সমাজগড়ে উঠে। ফলে মানুষ ব্যক্তি জীবনসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হাজারো সমস্যায় নিপতিত হয় অর্থাৎ মানুষ অসংখ্য যৌনব্যাধির শিকার হয় এবং সমাজে চলে হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ইত্যাদির মতো চরম অবক্ষয়। যা মানুষের সভ্যতাকে তিলে তিলে নষ্ট করে পঙ্গু করে ফেলে। তাই যারা ধর্মের কিছু আচার, অনুষ্ঠান (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) পালন করে তৃপ্তির সাথে বলে আমি রাজনীতি করি না তারা মূলত কুফুরীই করে। যারা মানুষকে কোরআনের রাজনীতির দিকে ডাকে না তাদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ


www.pathagar.com

দ্বীন মানা হয় না। আল্লাহর দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে মানুষের কল্যাণ। মানুষকে যারা কল্যাণের দিকে বা উত্তম নীতির দিকে ডাকবে তারাই হবেন আল্লাহর প্রতিনিধি। সুতরাং মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা বা উত্তম নীতির দিকে ডাকাই হবে নীতির রাজা রাজনীতির দিকে ডাকা। অথবা আল্লাহর নীতি রাজনীতির দিকে ডাকা। এ কাজটা যারা আন্তরিকতার সাথে করবেন, তারাই হবেন সফলকাম।

আল্লাহ বলেন- 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয় যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, ভাল কাজে নির্দেশ দিবে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এমন লোকেরাই হবে সফলকাম। যারা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, স্পষ্ট হেদায়েত আসার পরও যারা মতভেদ করছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। এমন লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' (আলে-ইমরান-১০৪-১০৫)

'যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে তারাই পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, শান্তি শৃংখলা বিধানের কোন কাজ তারা করে না, এ ধরনের নেতাদের নেতৃত্ব তোমরা আদৌ স্বীকার করবে না।' (শু'আরা ১৫২)

'আমি আমার রাসূলগণকে দলিল-প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি, আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য নির্ধারণকারী বিধি-বিধানের মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।' (আল কোরআন)

রাজার নীতি রাজনীতির আইন-কানুন মানব রচিত, মানব রচিত আইন হলো জাহিলিয়াতে ভরপুর। এর মাধ্যমে মানুষের কোন কল্যাণ আসে না। তাই আল্লাহ মানব রচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন- 'আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা কাফির।' (মায়িদা ৪৪)

'তারা কি জাহিলিয়াতের (মানব রচিত) ফয়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে।' (মায়িদা ৫০)

'সেই আইন বিধানের অনুসরণ কর যা তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক বা নেতার অনুসরণ কর না।'(আ'রাফ ৩)

মানুষের মাঝে উত্তম নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা বা রাজনীতি ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। সমাজে উত্তম নীতি প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অপরিসীম। এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃংখলা বজায় থাকে। মানুষ আখেরাতমুখী হয়। তারা শয়তান ও তাগুতি জীবন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। মানব জাতির কল্যাণের জন্য স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম ও রাজনীতি একি সূতায় গাঁথা । এখানে ধর্মই রাজনীতি এবং রাজনীতিই ধর্ম। এটি মানুষের স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ধর্ম থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। তবে অধর্ম ও রাজার নীতি রাজনীতির কথা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় অধর্ম ও রাজার নীতি রাজনীতির মাঝেও সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে ধর্ম ও রাজনীতির তুলনামূলক সম্পর্কের প্রতিবেদন তুলে ধরা হল ঃ


www.pathagar.com

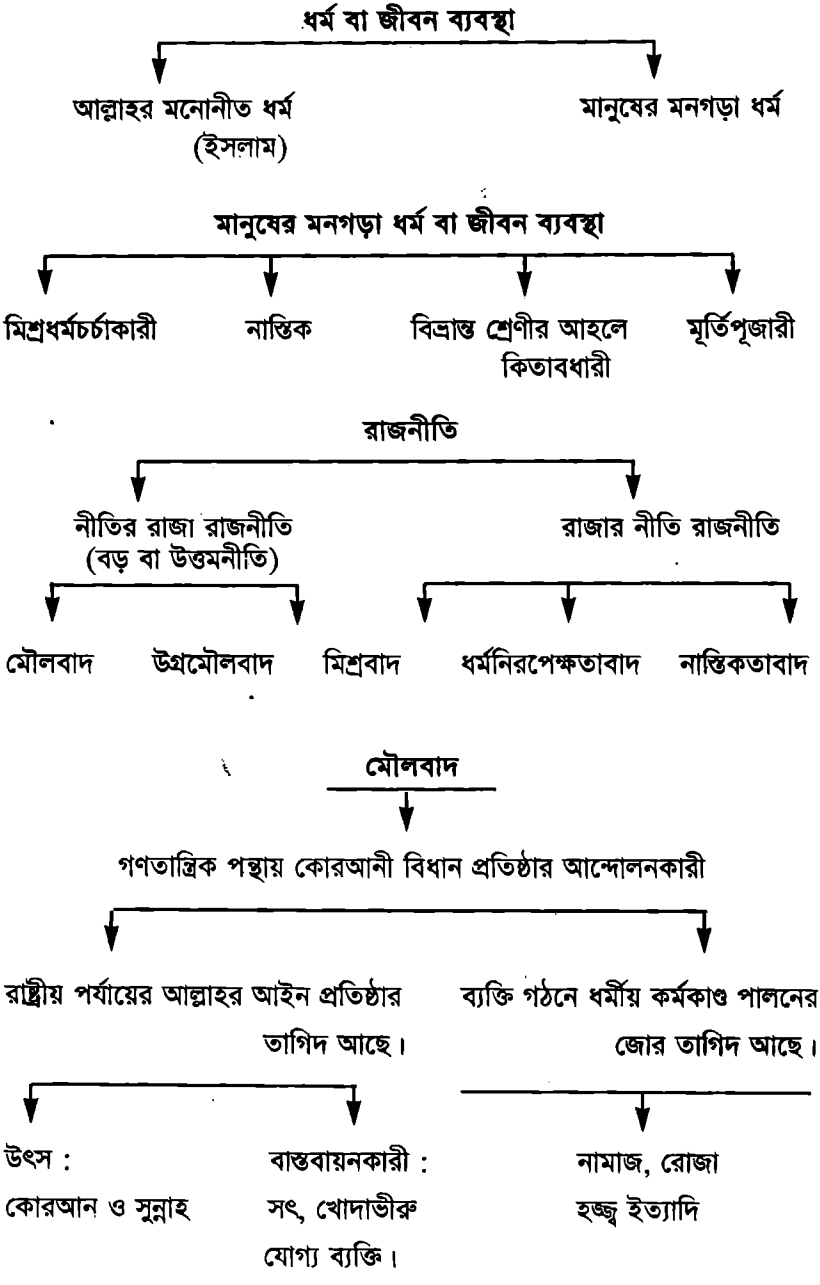

**ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা**

- আল্লাহর মনোনীত ধর্ম (ইসলাম)
- মানুষের মনগড়া ধর্ম

**মানুষের মনগড়া ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা**

- মিশ্রধর্মচর্চাকারী
- নাস্তিক
- বিভ্রান্ত শ্রেণীর আহলে কিতাবধারী
- মূর্তিপূজারী

**রাজনীতি**

- নীতির রাজা রাজনীতি (বড় বা উত্তমনীতি)
  - মৌলবাদ
  - উগ্রমৌলবাদ
- রাজার নীতি রাজনীতি
  - মিশ্রবাদ
  - ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
  - নাস্তিকতাবাদ

**মৌলবাদ**

↓

গণতান্ত্রিক পন্থায় কোরআনী বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী

- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার তাগিদ আছে।
  - উৎস : কোরআন ও সুন্নাহ
  - বাস্তবায়নকারী : সৎ, খোদাভীরু যোগ্য ব্যক্তি।
- ব্যক্তি গঠনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের জোর তাগিদ আছে।
  - নামাজ, রোজা হজ্জ্ব ইত্যাদি



www.pathagar.com

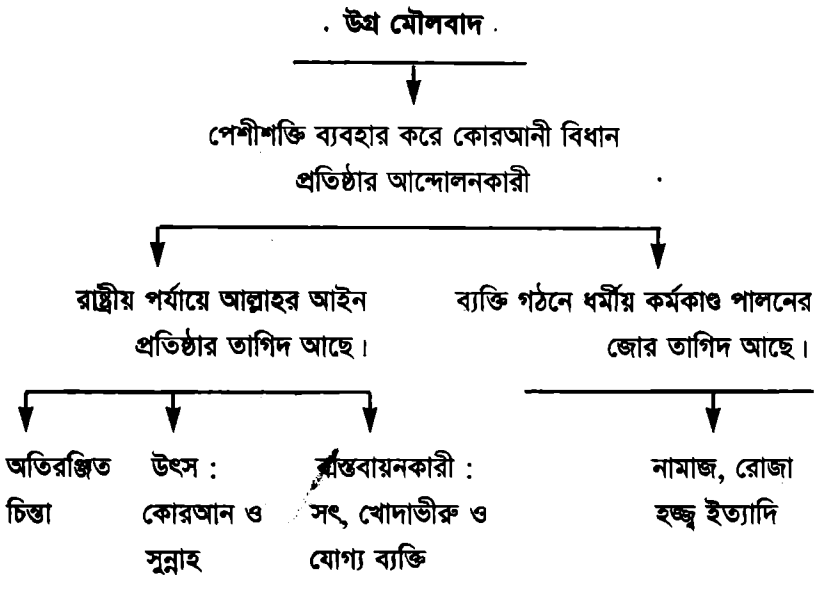

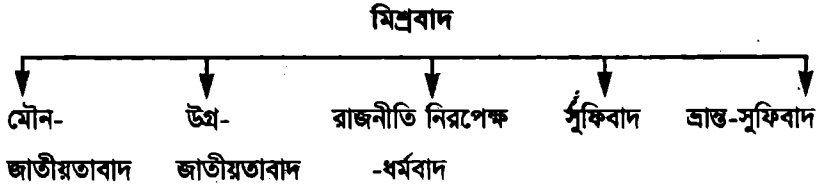

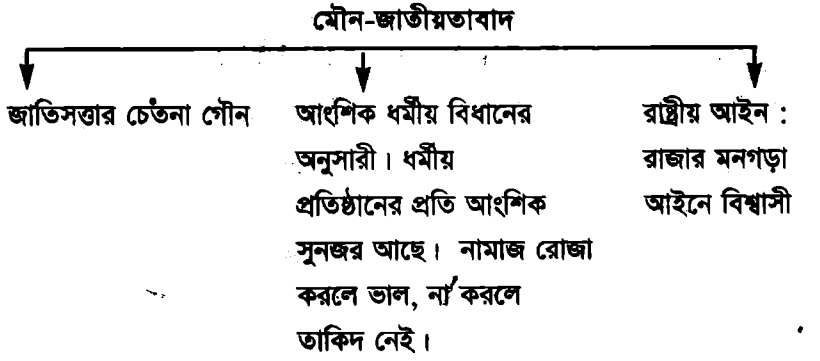

### উগ্র মৌলবাদ

- পেশীশক্তি ব্যবহার করে কোরআনী বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী
  - রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার তাগিদ আছে।
    - অতিরঞ্জিত চিন্তা
    - উৎস : কোরআন ও সুন্নাহ
    - বাস্তবায়নকারী : সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য ব্যক্তি
  - ব্যক্তি গঠনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের জোর তাগিদ আছে।
    - নামাজ, রোজা হজ্জ্ব ইত্যাদি

### মিশ্রবাদ

- মৌন-জাতীয়তাবাদ
- উগ্র-জাতীয়তাবাদ
- রাজনীতি নিরপেক্ষ-ধর্মবাদ
- সুফিবাদ
- ভ্রান্ত-সুফিবাদ

### মৌন-জাতীয়তাবাদ

- জাতিসত্তার চেতনা গৌন
- আংশিক ধর্মীয় বিধানের অনুসারী। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আংশিক সুনজর আছে। নামাজ রোজা করলে ভাল, না করলে তাকিদ নেই।
- রাষ্ট্রীয় আইন : রাজার মনগড়া আইনে বিশ্বাসী



www.pathagar.com

## উগ্র-জাতীয়তাবাদ

জাতিসত্তার চেতনা তীব্র ও সাম্প্রদায়িক।

আংশিক ধর্মীয় বিধানের অনুসারী। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আংশিক সুনজর আছে। নিজেরা নামাজ, রোজা করে।

রাষ্ট্রীয় আইন : আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কোন অনুভূতি নেই।

## রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ

আংশিক ধর্মীয় বিধান মানে এবং অন্যকে মানার জন্য দাওয়াত দেয়।

রাষ্ট্রীয় আইন : কোরআনি আইন প্রতিষ্ঠার কোন তাকিদ নেই। বরং এ ব্যাপারে উদাসীন। নির্বাচনের সময় সেক্যুলারপন্থীদের ঘাড়ে সোয়ার হয়।

## ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ

আংশিক ধর্মীয় বিধান মানলে বাধা নেই। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান মানা না মানা ব্যক্তিগত ব্যাপার। না মানলে কোন তাগিদ নেই।

রাষ্ট্রীয় আইন : রাজার মনগড়া আইনে বিশ্বাসী। এবং কোরাআনি আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি নয়।

## সুফিবাদ

আংশিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে ও তাগিদ দেয় এবং তছবি, জিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনী আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদাসীন। সারা রাত-দিন শুধু মাটির নীচের কথাই (কবরের) বলে। কখনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।



www.pathagar.com

**ভ্রান্ত সুফিবাদ**

কায়েমী স্বার্থবাদী
পীর, ফকির

বৈরাগ্যবাদী ও ভণ্ড
মারেফাতের ফকির

**কায়েমী স্বার্থবাদী পীর, ফকির**

ঢোল বাজনা, কাউয়ালী গান, হালকা জিকির ইত্যাদিতে মগ্ন। তারা মাজার ও পীর পুজারী। ওরশের নামে বাবার দরবারে মানত দেয় ও নেয়।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনী আইন ও নামাজ, রোজার ধার ধারে না। রাজাকে মনগড়া আইন করতে উৎসাহিত করে। রাজা যতই মনগড়া আইন করুক তাতেই তাদের মঙ্গল।

**বৈরাগ্যবাদ**

ধর্মীয় কোন বিধি-বিধানের ধার ধারে না। লালসালু আর গাঁজায় অভ্যস্ত।

রাষ্ট্রীয় আইন :
কে রাজা, কে কি, তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই।

**নাস্তিক্যতাবাদ**

জাহিলি রীতি-নীতি পালন করে স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়।

রাষ্ট্রিয় আইন :
রাজার মনগড়া বিধান বাস্তবায়নে কট্টর মনোভাবাপন্ন। আল্লাহর আইন সহ্য করতে পারে না।

**ইসলাম**
(একমাত্র আল্লাহর মনোনিত ধর্ম বা জীবন বিধান)

রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস : আল কোরআন

ব্যক্তিগঠনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড (নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত)

ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী সংস্কৃতি

**বাতেলধর্ম**
(মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা)

জাহেলি রীতিনীতির অনুসারী (মানব রচিত)

রাষ্ট্রীয় আইন (মানব রচিত)

অর্থনীতি, সংস্কৃতি (মানব রচিত)


www.pathagar.com

ধর্ম ও রাজনীতির তুলনামূলক ব্যাখ্যায় দেখা যায় ধর্মের যেমন দু'টি শাখা রয়েছে তেমনি রাজনীতিরও দু'টি শাখা আছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের সাথে "নীতির রাজা রাজনীতির' সম্পর্ক রয়েছে। আবার মানব রচিত ধর্মের (বাতেল ধর্মের) সাথে রাজার নীতি রাজনীতির' সম্পর্ক রয়েছে। তাই বলা যায় মানুষের ধর্মই রাজনীতি বা রাজনীতিই হল-ধর্ম। এ পর্যায়ে ধর্ম থেকে রাজনীতি কিংবা রাজনীতি থেকে ধর্ম আলাদা করার কোন উপায় নেই। মানুষ আল্লাহর মনোনীত পথে জীবন পরিচালনা করলে সে হক ধর্মের (ইসলাম) অনুসারী হবে। কিংবা আল্লাহর মনোনীত নয় এমন পথে জীবন পরিচালনা করলে সে হবে বাতেল ধর্মের (শয়তানের) অনুসারী। আবার নিজের মধ্যে উত্তম নীতি বা নীতির রাজার গুণ সৃষ্টি করতে হলে মানুষকে আমল করতে হবে 'আল্লাহর নীতি রাজনীতি'। অপরদিকে 'রাজার নীতি রাজনীতি' মানুষকে জাহিলী জীবন ব্যবস্থার অনুসারী বানিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর নীতি রাজনীতি হলো মানুষের জন্য স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। যে নীতি সকল নীতির চেয়ে উত্তম বা বড় সেটিই হলো আল্লাহর নীতি। মানুষ যখন আল্লাহর নীতিতে বা রঙে রঞ্জিত হয় তখন তার দ্বারা সমাজে কেউ কষ্ট পায় না। কিন্তু বাতেল জীবন ব্যবস্থার অনুসারীরা কখনো উত্তম নীতির অধিকারী হয় না। ফলে এ শ্রেণীর লোক শাসক হলে জনগণ তার রাজ্যে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। তাই সমাজের সাধারণ লোক থেকে নিয়ে শাসক শ্রেণীর সকলের মাঝে উত্তম নীতি থাকা চাই। সুতরাং উত্তম নীতি গড়তে হলে সকলকেই করতে হবে আল্লাহর নীতি রাজনীতি। আল্লাহর নীতি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হলো কেউ এই দাওয়াত কবুল করার সাথে সাথে অপর বাতেলপন্থীকে এই দাওয়াত কবুল করার জন্য আহবান জানাতে হবে। অর্থাৎ দাওয়াত কবুলকারীর জীবনে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। এর ফলে দাওয়াত প্রদানকারীর মাঝে উত্তমগুণ পয়দা হতে থাকে। সুতরাং আল্লাহর নীতি রাজনীতিই মানুষের জন্য কল্যাণমুখী ধর্ম বা কল্যাণমুখী রাজনীতি।

## রাজার নীতি রজনীতির কুফল

মানুষের দেখা, চিন্তা, কর্ম আপেক্ষিক। অর্থাৎ মানুষের দেখা সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নয়। মানুষ এখন যা ভাল মনে করে, যা সত্য বলে ধরে নেয়, সেটি অন্য সময় খারাপ হয় বা অসৎ বলে প্রমাণিত হয়। আবার মানুষ অন্যের নিকট থেকে সুবিধা নিতে চায়। ফলে রাজা নিজেও অন্যের কাছ থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য দুর্বল আইন প্রণয়ন করে। এতে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর জন্ম হয়। অপরদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বাতেল রীতি (ঝাড়ফুক, কবর পূজা ইত্যাদি) রীতি চালু হয়। ফলে দ্বীনের নামে অনেক ব্যবসায়িক (পীর, ফকির) শ্রেণী গড়ে উঠে। সমাজের যুবক শ্রেণীর মধ্যে অনেক মারদাঙ্গা বাহিনী, ছিনতাইকারী, হাইজ্যাকার, খুনী, ডাকাত সৃষ্টি হয়। আর মহিলাদের মধ্যে অশ্লীলতা এবং দেহ ব্যবসার রীতি ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শোষক শ্রেণী গড়ে উঠে। মদ, জুয়া,


www.pathagar.com

অবাধে চলে। সুদ, ঘুষ মিথ্যার সয়লাব হয়ে যায়। পরকিয়া, সমকাম, উভয়কাম, নারীতে নারীতে বিয়ে এবং পুরুষে পুরুষে বিয়ের রীতি চালু হয়। কিন্তু রাজা তার গদি ধরে রাখার জন্য এসব মানবতা বিধ্বংসী কাজের কোন বাধা দেয় না। এতে মানুষ দিনে দিনে অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ও অবাধ যৌনচারে অভ্যস্ত হয়ে মৃত্যুর দারপ্রান্তে হাজির হয় এবং সমাজ এক ভয়াবহ বিষ ফোড়ায় পরিণত হয়। চারদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার বিরাজ করে। কোথাও শান্তির লেশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজা তার মতোই চলে। সে কখনো কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর বিপক্ষে যায় না। ফলে সমাজে কখনো শান্তি ফিরে আসে না। মূলত এ সবই রাজার নীতি রাজনীতির কুফল।

## রাজনীতিহীন ধর্মচর্চার কুফল

আমাদের দেশে কিছু লোক আছে যারা দ্বীনে হকের কিছু আচার, অনুষ্ঠান পালন করে (নামাজ, রোজা, হজ্জ, কোরআন তেলাওয়াত) কিন্তু রাজনীতি করে না। কার্যত দেখা যায় তারা রাজনীতিকে ঘৃণার চোখে দেখে। এ ধরনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে বলা হয়েছে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। এরা হলো তাবলীগ জামায়াতের কিছু লোকজন। কওমী মাদ্রাসা হতে ফারেগ হওয়া কিছু ইমাম, মোয়াজ্জেন, শিক্ষকবৃন্দ এবং পীর ফকিরগণ। তারা ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণাঙ্গ পরিশুদ্ধ না হলেও যতটুকু শুদ্ধ থাকেন তাতেই সমাজের লোক তাদেরকে সুফি মনে করেন। পূর্ণাঙ্গ পরিশুদ্ধ বলা যায় না এ কারণে যে তারা অনেকেই সুদী লেন-দেনের সাথে সম্পর্কিত থাকেন এবং দ্বীনে বাতেলের অনুসারীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন আবার তাদের থেকে দান খয়রাতও গ্রহণ করেন। অপরদিকে তারা সৎকাজে হালকা তাগিদ দিলেও অসৎকাজে একেবারেই নিষেধ করেন না এবং দ্বীনে হককে বিজয়ী করার আন্দোলনে শরীক হন না। পাশাপাশি তারা নীতির রাজা রাজনীতি (আল্লাহর নীতি রাজনীতি) করেন না বিধায় ধর্মীয় শিক্ষাহীন জনগণ মনে করেন দ্বীনের কাজ শুধু নামাজ রোজাতে সীমাবদ্ধ। আসলে ধর্মে রাজনীতি থাকলে তো যাদের গায়ে ধর্মীয় লেবাছ আছে এবং যারা সারাক্ষণ দ্বীনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তারা তো অবশ্যই রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতেন। যেহেতু তারা কোরআনি রাজনীতি করেন না এবং তার কথা বলেনও না, সে কারণে জনগণের মনেও কোরআনি রাজনীতির প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। এতে করে যারা ধর্মে রাজনীতি আছে এ কথা বলে কোরআনি রাজনীতির দাওয়াত নিয়ে জনগণের কাছে যায় তখন জনগণ তাদের দাওয়াত তো কবুল করেই না বরং উল্টো তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বী ও কওমী ইমামগণকে মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে কোরআনি রাজনীতির দাওয়াত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন যদি তাদেরকে বলা হয় কোরআনি রাজনীতি করা ফরজ। আপনারা ইমাম সাহেবদের এবং তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। বাস্তবে দেখা যায় তারা ওদের কাছে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন এবং তারপর


www.pathagar.com

থেকে কৌশলে তারা কোরআনি রাজনীতির আহবানকারীদেরকে এড়িয়ে চলেন। দ্বিতীয় আর একটি খারাপ দিক হলো তারা নবীআনা কাজের দাবী করে যে পন্থায় তাদের মিশন চালাচ্ছেন এটা কিন্তু সঠিক নবীআনা কাজের দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। যেমন নবী-রাসূলগণ দ্বীনে হকের দাওয়াত দেয়ার সময় একই সাথে তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করেছেন এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এসব ছেড়ে দিয়ে যারা শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ, অযু, গোসল, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির দাওয়াত দিয়ে এটাকেই নবীআনা কাজ বলে চালিয়ে যাচ্ছেন তারা যেমন নিজেরা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তেমনি মানুষের মাঝেও এক ধরনের ভ্রান্ত আকিদা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। এতে করে নবীআনা কাজের নামে একটা বেদ'আতী রীতি চালু হচ্ছে। বেদ'আত হলো এমনি একটা রীতি যা সওয়াবের আশায় দ্বীনের নামে চালু হয় অথচ এ কাজটা রাসূল (সা.) কখনো এ রীতিতে করেননি। বর্তমানে প্রচলিত নবীআনা কাজের নামে যে দাওয়াতের পদ্ধতি চালু আছে তা কখনো নবী-রাসূলগণ অনুসরণ করেননি। নবী-রাসূলগণের দাওয়াতে পদ্ধতির ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

তাঁরা বলতেন- 'হে দেশবাসী, হে আমার কওমের লোক, তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, হুকুমদাতা ও আইনদাতা। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াতের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় বিধানদাতা (রাজার আইন) কে অস্বীকার করার কোন উছুল নেই। অথচ তারা এটাকেই বলেন নবীআনা কাজ। কিন্তু রাসূল (সা.) প্রথমে কালেমাও ঈমান কবুল করার দাওয়াত দিতেন। যারা দাওয়াত কবুল করতেন তাদেরকেই নামাজ শিক্ষা দিতেন। এখানে কালেমা ও ঈমান কবুল করার মাধ্যমে মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ করা হত। অর্থাৎ মানুষের মন-মগজ থেকে সকল প্রকার জাহিলী-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতি দূর করে ওহীর জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই নবীদের দাওয়াত ও তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদে বিশ্বাসীগণ মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ না করেই নামাজ রোজা ইত্যাদির দাওয়াত দেন। এর ফলে নামাজী বৃদ্ধি হলেও তাদের মাঝে জাহিলী চিন্তাধারা থেকে যায়। এ ধরনের লোকেরা পরবর্তিতে দ্বীনে হকের আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এ জন্যই তাবলীগ জামায়াত দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে একটা বড় ক্ষতিকর ফেরকা।'

## ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-এর oxford dictionony সংজ্ঞা হলো- 'Belief that morality education should not be based on religion' অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মনির্ভর না হওয়ার মতবাদ। এটি হলো পশ্চিমা দেশের dictioany-এর কথা। কিন্তু আমাদের দেশের


www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ এর অর্থ করেছেন-কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা এবং যার যার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অধিকার। এখানে দেখা যায় পশ্চিমা dictioany সংগা এবং আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সংগা এক নয়। কিন্তু এটা যে উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেন গ্রহণযোগ্য নয় সেটিই নিম্নে তুলে ধরা হল। মূলত তিনটি কথার সমন্বয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শব্দটির উৎপত্তি। যেমন- ধর্ম+ নিরপেক্ষ+মতবাদ= ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। আমাদের জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে ধর্মের অনুশাসন বলতে কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে ধর্ম থাকবে নিরপেক্ষ। সে ক্ষেত্রটি কি? এটি হলো রাজনীতি। এ পর্যায়ে বলা যায় রাজনীতি থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেয়ার যে মতবাদ তাকেই বলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ মতবাদে মানব জীবনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমন্বয়হীনতা ঘটে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধর্ম ও রাজনীতি এক ডালে অবস্থান কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া হয় না। এর মাধ্যমে বুঝায় ধর্ম রাজনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে না আবার রাজনীতি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। এ কথার তাৎপর্য্য হলো রাজার নীতি বা আইনেই রাজনীতি এবং ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠান হলো সৃষ্টিকর্তার বিধান। এখানে রাষ্ট্রীয় রীতি -নীতি, আইন-কানুন সংস্কৃতি ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তার বিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সেটিই নিম্নে ব্যাখ্যা দেয়া হল।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তাই জীবন যুদ্ধে অনেক সমস্যায় তাকে পোহাতে হয়। এ সমস্যাগুলো চারটি পর্যায়ে আসতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। কোন সমস্যায় পড়লেই মানুষ সমাধানের পথ খুঁজে। কিংবা কোন অন্যায়, অবিচার হলেও মানুষ বিচার ফয়সালার পথ তালাশ করে। তাই জীবন সমস্যা সমাধানের পথ ও আইন-কানুন বা রীতি-নীতি থাকা প্রয়োজন। এ রীতি-নীতিকেই বলা হয় রাজনীতি। এখানে 'রাজ' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ধরলে রাজনীতিকে বলা যায় বড় বা উত্তম নীতি। অর্থাৎ সকল নীতির বড় বা উত্তম যে নীতি সেটাই হলো রাজনীতি। এটা হলো নীতির রাজা রাজনীতি। আবার রাজনীতির 'রাজ' শব্দটিকে যদি 'রাজার' মনে করা হয় তবে রাজার কথা, কাজ, আদেশ, নিষেধ, বিচার-ফয়সালা, আইন-কানুন, রীতি-নীতি সবই হবে রাষ্ট্রের আইন বা নীতি। এটা হলো রাজার নীতি রাজনীতি। এখানে রাজার আইন হবে জীবন সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। এ ক্ষেত্রে রাজা যতটুকু ধর্মের রীতি-নীতি পালন করার অনুমতি দিবেন প্রজাগণ ততটুকুই পালন করতে বাধ্য হবে। এখানে দেখা যায় রাজার নীতি রাজনীতি পরোক্ষভাবে হলেও ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু রাজনীতি যদি বড় বা উত্তম নীতি হয় তবে কোন অবস্থায় এ রাজনীতির মাধ্যমে স্রষ্টার মনোনীত ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে না। কারণ বড় বা উত্তম নীতি সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত


www.pathagar.com

অন্য কেউ প্রবর্তন করতে পারবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তার কোন প্রয়োজন বা অভাব নেই। তিনি নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য দুর্বল আইন করতে হবে না। কারণ তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাই আল্লাহর নীতিই হলো উত্তম নীতি। কিন্তু মানুষের প্রয়েজন আছে, অভাব আছে, তারা পরমুখাপেক্ষী এবং তারা নিজের গদি টিকিয়ে রাখার চিন্তা করে। এ সব কারণে মানুষ প্রবৃত্তির (নফসের) তাগিদে কখনও কখনও নীতি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের কথা ভিন্ন কারণ তাঁরা সরাসরি অহী ও ফেরেস্তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। তাই অহীর মাধ্যমে যারা নিয়ন্ত্রিত হননি কিংবা অহীর কিতাব যারা অনুসরণ করেন না তাদের নীতি বা আইনে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ কারণে রাজার আইন সমাজের বিধান হিসেবে মানা ঠিক নয়। মূলত আল্লাহকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ইলাহ মানা উচিত। অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র হুকুমদাতা, বিধানদাতা এবং তাঁর হুকুমের বিরোধী রাজার হুকুম অমান্য করে চলার নামই হচ্ছে তাওহীদ।

রাজার নীতি রাজনীতির প্রবর্তক হলো মানুষ, আর নীতির রাজা রাজনীতির প্রবর্তক হলো সৃষ্টিকর্তা। মানুষ যখন রাজার আসনে বসে আইন তৈরি করে তখন তার গদি ধরে রাখার চিন্তা করে। ফলে সুবিধাভোগী জনগণকে অবৈধ সুবিধা দেয়ার জন্য মনগড়া আইন করে। এতে অন্যরা নির্যাতিত ও শোষিত হয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী। এভাবে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জীবনাচার গড়ে উঠে। কিন্তু রাজা তার গদি ধরে রাখার জন্য বাতেল জীবনাচারকেও রাজনৈতিক স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে থাকে। অথচ বড় নীতি বা উত্তম নীতির বেলায় বাতেলপন্থীগণ-এ ধরনের সুবিধা পাওয়ার আশা করতে পারে না। অপরদিকে উত্তম নীতির ধারক-বাহক হওয়ার জন্য মানুষকে কিছু ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা জীবনাচার (নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত) পালন করতে হয়। মূলত নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হলো উত্তমনীতির ধারক-বাহক হওয়ার প্রশিক্ষণ। তাই ধর্মের মূল উপাদান হলো রাজনীতি। অর্থাৎ কল্যাণমুখী রাজনীতির মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া এবং আখিরাতে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। কিন্তু রাজার নীতি রাজনীতিতে মানুষের মাঝে উত্তম নীতি তৈরি হওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। এবং তারা কল্যাণমুখী আইন তৈরি করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাজার নীতি রাজনীতির একটি শাখা। তাই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কল্যাণমুখী রাজনীতির মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত নয়। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকলে এমন সব জীবনাচার গড়ে উঠে যা মানবতাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। এবং মানুষ শয়তানের অনুসারী হয়ে জাহান্নামমুখী হয়ে যায়। এসব বাতেল জীবনাচার গুলো হলো লালসালু, সন্ন্যাসী, গাজার ফকির, কবর ও মাজার পূজারী, পীর পূজারী, মদখোর, যীনাখোর, বেশ্যাবৃত্তি, সুদখোর ইত্যাদি আরও অনেক বিচিত্রময় জীবনাচার। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এগুলোতে কোন বাধা দেয় না। ফলে এটি যেহেতু


www.pathagar.com

বাতেল জীবনাচার গড়ে উঠতে সাহায্য করে, এ জন্য এটি একটি বাতেল ও ভ্রান্ত আকিদা বা মতবাদ। যা জাহেলী বা মনগড়া জীবন ব্যবস্থা। অর্থাৎ জাহেলী বা মনগড়া জীবন ব্যবস্থার অপর নামই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

এবার আসা যাক ধর্মের আলোচনায়। ধর্ম কি? মূলত ধর্ম হলো জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের জীবন পদ্ধতি বা আচার-আচরণ বিধির নামই হলো জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে দু'ধরনের জীবন ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন একটি হলো জাহেলী বা মনগড়া জীবন ব্যবস্থা। আর অপরটি হলো আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানুষের জীবন ব্যবস্থার বড় একটি উপাদান হলো সংস্কৃতি। সংস্কার থেকে সংস্কৃতির উদ্ভব। যেখানে সংস্কার নেই সেখানে অপসংস্কৃতি ও অসংস্কার জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অসংস্কার জীবন ব্যবস্থায় বাতেল ও জাহেলী রীতি-নীতিতে ভরে যায়। ফলে বহুবিদ জীবনাচার বা জীবন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংস্কারক পাঠান। তিনি অহীর মাধ্যমে পরিচালিত হন। তিনি হন মানব জাতির পথ প্রদর্শক ও সর্তককারী। এভাবে যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জীবন বিধান নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছেন। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের মূলগ্রন্থ আল কোরআন প্রেরণ করেছেন। এতে মানব জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের যেমন সমাধান রয়েছে তেমনি রয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সমাধান। তাই ইসলাম মানতে হলে রাজনীতিসহ ধর্মীয় সকল আচার-অনুষ্ঠান মানতে হবে। শুধু আংশিক কিছু (নামাজ, রোজা, হজ্ব, অযু, গোসল) মানলে চলবে না। আগেই বলছি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হলো উত্তম নীতির ধারক-বাহক হওয়ার প্রশিক্ষণ। এ ক্ষেত্রে ধর্মের মূল উপাদান হলো রাজনীতি। ফলে ধর্মও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই ধর্ম থেকে রাজনীতি এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। কিন্তু এ সত্যকে অস্বীকার করে যারা ধর্ম থেকে রাজনীতি বা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করতে চান তারা মূলত আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করেন। সে জন্য বাতেল চিন্তার উৎস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানব জাতির কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কারণ আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান ছাড়া সমাজে শান্তি আসার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতি ও জ্বিন জাতিকে শুধু তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন- 'আমি জ্বিন ও মানুষগণকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এই (সৃষ্টি করিয়াছি) যে, তাহারা আমার বন্দেগী করিবে।' (সূরা আয-যারিয়াত আয়াত-৫৬)

আল্লাহর বন্দেগী বা ইবাদত শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, অযু, গোসল ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পূজা, উপাসনা, আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা বা মানা বা অনুসরণ করা যাবে না। অর্থাৎ যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে- তাদের রাজার আইন বা রাজার রচিত বিধান মানার কোন এখতিয়ার দেয়া হয়নি। কেউ যদি দ্বীনের কিছু অংশ (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) মানে


www.pathagar.com

এবং কিছু রাজার রচিত বিধান মানে তবে বুঝতে হবে এটা তার মনগড়া আনুগত্য। এধরনের আনুগত্য ও দ্বীনের অনুসরণ করার জন্য আরবের কাফের সরদাররা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বহু বার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাঁকে ধনসম্পদ, সুন্দরী-রমণী, রাজত্ব সবই দেয়ার প্রস্তাব করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা কাফেরুনের মাধ্যমে সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ স্বীকৃতি দেননি। সুতরাং এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাস ও অনুসরণ আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী। আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী সকল মতবাদ সমাজে বিশৃঙ্খলা ও কুফল বয়ে আনে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কারও কাম্য হওয়া উচিত নয়।

## রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ

'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ' বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের রোগ। এটি বর্তমানে বিষ ফোড়ার মতো আকার ধারণ করছে। তাই এক্ষণি এটিকে অপারেশন করা জরুরি। এতো দিন ভেবে ছিলাম রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদী বন্ধুগণ আর যাই হোক দ্বীন ভুলা মানুষদেরকে তো নামাজ, রোজা পাক পবিত্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। এটা তো অবহেলা করার মতো নয়। যারা এক সময় কালেমাই জানত না। তারা যখন নামাজ, রোজা করে এটা সুখবর বটে। কিন্তু এতো দিন যা ভেবে ছিলাম এখন দেখছি তারা যতটুকু দ্বীনের উপকার করছে তার চেয়ে একশত ভাগ বেশি দ্বীন ইসলামের ক্ষতি করছে। তাই এই অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। এ জন্য বিষয়টির প্রতি সকলের গুরুত্ব দেয়া জরুরি। মূলত কারও দোষত্রুটি তালাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ইসলামের সঠিক তথ্য মানবতার মহৎ কল্যাণে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বিষয়টি একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। কিন্তু এতে দুঃখ করে লাভ নেই। কারণ মানবতার কল্যাণে এ সম্পর্কে কিছু না লিখলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি আশা করব যাদের বিপক্ষে লেখাটি চলে যাবে তারা যেন বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে ভুল সুধরিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেন।

### রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ কি?

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। জীবনের এমন কোন শাখা নেই যেখানে ইসলামের পদচারণ নেই। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদিসহ রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল কিছুর সমাধান এতে রয়েছে। ইসলামী বিধান মানতে হলে এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে এবং ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও রীতি-নীতির বিরোধিতা বা নিষেধ করতে হবে। এখানে ইসলামী বিধানের কিছু রীতি-নীতি পালন করে বাকি জীবনে ইসলামের বিপরীত


www.pathagar.com

রীতি-নীতির বিরোধিতা না করে আপোষকামী হয়ে তাদের সাথে সহঅবস্থান করার কোন সুযোগ নেই। এভাবে যারা কাজ করবেন তারাই মুসলিম হিসেবে গণ্য হবেন। এটা হলো ঈমানের দাবীর সঠিক পথ। অথচ দেখা যাচ্ছে আমাদের সমাজে কিছু কিছু দল এবং প্রতিষ্ঠান ইসলামের খণ্ডিত অংশ অনুসরণ করছে। আর বাকিগুলো নিজেরা তো মানেই না এবং অন্যকে তা মানতে বলেন না। পাশাপাশি ঐ বিষয় গুলোকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং যারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানার দাওয়াত দিয়ে থাকেন বরং তাদের কথার কোন গুরুত্ব দেন না। কিংবা সময় পেলে বিরোধিতা না করে ছাড়েন না। তারা যেগুলো মানেন সেগুলো হলো নামাজ, রোজা, হজ্জ, অযু-গোসল ইত্যাদি। আর যেগুলো করে না সেগুলো হলো ইসলামী অর্থনীতি (যাকাত, ওশর, সুদমুক্ত লেনদেন), ইসলামী রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা ইকামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের এই খণ্ডিত অংশ মেনে কি সঠিক মুসলমান হওয়া যাবে? নিশ্চয়ই নয়। ইসলামের খণ্ডিত অংশের বিশ্বাসী মতবাদকে বলা হয় 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। এটা পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিকতাবাদের মতোই একটা মতাদর্শ। এদেরকে বলা যায় খণ্ডিত ইসলামপন্থী। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামের কিছু অংশ মানে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতেল রীতি-নীতি অনুসরণ করেন। আবার কেউ কেউ ইসলামের কিছু অংশ মানেন এবং বাতেল রীতি-নীতি নিজে না মানলেও তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, কখনো তাদের বিরোধিতা করেন না। এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা আমল আখলাক সুফী পর্যায়ের। তারা মাটির উপরের জিনিস পত্র ভোগ করলেও সারা দিন শুধুমাটির নীচের খবর নিয়ে ব্যবস্থা থাকেন। কিন্তু তারা দুনিয়ার শৃঙ্খলা আনতে ইসলামী রাজনীতির ধার ধারে না। এরূপ আকিদাগত লোকদেরকেই বলা হয়েছে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদী।

## রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয়

আমাদের দেশের প্রচলিত তাবলীগ জামায়াত, কিছু কিছু কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, পীর, ফকির এবং মসজিদের কিছু সংখ্যক ইমামগণ রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদে বিশ্বাসী। তারা কখনো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হোক সে চেষ্টা করেন না। কোরআনকে তারা শুধু নামাজ, রোজা, দোয়া কালাম এবং ওজিফাতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাদের কোন একটা কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নেই। তাদের অনেকেই রাজনৈতিক জীবনে আছেন সেক্যুলার এবং অর্থনৈতিক জীবনে রয়েছেন সুদীব্যাংকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অপরদিকে সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছেন মঙ্গল প্রদীপ ওয়ালাদের সাথে যুক্ত। কিছু লোক এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলেও তারা রয়েছেন রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং বাতেলপন্থীদের দান খায়রাতের উপর নির্ভরশীল। এরা পরোক্ষভাবে


www.pathagar.com

বাতেলপন্থীদের দান খয়রাত গ্রহণ করে তাদেরকে জান্নাতের টিকেট দিয়ে থাকেন (এটা বাতেলপন্থীদের আকিদা)। নিম্নে এসব রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদে বিশ্বাসী লোকদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হলো।

## কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড

১৮৬৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয়। এর শাখা প্রশাখা বাংলাদেশ, ভারত, ও পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার মাওলানা, হাফেজ, মুফতী তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে এত কিছু শিক্ষা দেয়া হলেও কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শিক্ষা দেয়া হয় না। এ ধরনের কোন বিষয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মসূচীতে নেই। হাফেজ বা মাওলানা হয়ে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হবে, এ ধরনের কোন প্রোগ্রাম তাদের নেই। হাফেজ বা মাওলানা হয়ে নিজে এবং মাতা পিতার মাথায় নূরের টুপি পরাবেন এটাই বড় চেষ্টা। কিন্তু কোরআন দিয়ে যে সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় সে কথা জনগণকে বুঝানোর গুরুত্বই তাদের মধ্যে থাকে না। তারা এটাকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করে না। হাফেজ, মাওলানা হয়ে মসজিদ, মাদ্রাসার ইমামতি বা শিক্ষকতা করেই নিজের দায়িত্ব পুরিয়ে দেন। রাসূল (সা.) আজীবন দ্বীনে হককে বিজয়ী করার আন্দোলন করে গেছেন। নবীজী মক্কা মদীনাতে দ্বীনে হক বিজয়ী হওয়ার পর একে একে চারদিকের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দাওয়াত দিয়েছেন। এর ফলে আমাদের মতো দূর-দূরান্তের লোকেরা মুসলমান হতে পেরেছিল। নবীজী (সা.) ওফাতের পর সাহাবী এবং তাবেঈগণ সে কাজ করেছেন। তাঁরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেকেই দ্বীনে হককে বিজয়ী করার আন্দোলনে রত ছিলেন। এটাই নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য। মূলত প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জীবনের মিশন এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত আলেমদেরকে কোরআনের আইন বাস্তবায়নের কথা বললে তারা বলে এটা রাষ্ট্রের ব্যাপার। আমরা কি করব। আরও বলে জোর করে কারও উপর কোরআনের আইন চাপিয়ে দেয়া যায় না ইত্যাদি.....ইত্যাদি। কিন্তু নবী (সা.) জীবনের অনুসারী হতে হলে নবীর (সা.) পন্থায় দ্বীনি আন্দোলন যে করতে হবে সেটা তারা ভুলে গেছেন। তাদের এই অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষকে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে নিরুৎসাহিত করে রেখেছেন। এ জন্য তাদের এই রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ ইসলামের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ড

তাবলীগ জামায়াতের ভাইয়েরা মানুষকে তিন চিল্লার সাথী বানিয়ে কালেমা, নামাজ, রোজা, ওজু গোসল শিক্ষা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে ফেলেন। বাড়ীতে এসে তারা রাজনৈতিক জীবনে আগে যে সেক্যুলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল তাই থেকে যায়। তারা লম্বা দাড়ী, টুপি লাগিয়ে আল্লাহর আইনের বিরোধিতাকারীদের সাথে


www.pathagar.com

মিছিলে নেমে পড়ে। অর্থনৈতিক জীবনে নিজে সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় এবং অপরকে ঋণ পায়িয়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। আর সাংস্কৃতিক জীবনে ঢোল বাজনার গান শুনেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিও হন। অপরদিকে বিভিন্ন দিবসে প্রতিকৃতি ও স্মৃতিসৌধে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নগ্নপায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে এক মিনিট নিরবতা অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই হলো তাদের নবীআনা কাজের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের খণ্ডিত ইসলামী বিধান অনুসরণ করলে কতটুকু সুফল হবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আল কোরআন কি খণ্ডিত ইসলামী বিধান অনুসরণকারীদের মুক্তির গ্যারান্টি দেয়? আমি যতটুকু তালাশ করে পেয়েছি এ ধরনের কোন সুযোগ ইসলামে নেই।

আল্লাহ বলেন- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ভাবে ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করো।' (সূরা বাকারা ২০৮)

## পীর ফকিরদের কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের পীর, ফকিরগণ ধর্মের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। তারা দান খয়রাত মানত, হাদিয়া নিয়ে কোটিপতি হচ্ছেন। তাদের আস্তানায় সকল রাজনৈতিক দল মতের মানুষ যায়। তাই তারা কোন দলের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন করে ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালাতে চান না। তারা থাকেন রাজনীতি নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তাদের নিজেদের কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা যেমন রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে তেমনি তাদের মুরীদরাও সে ছিলছিলা গ্রহণ করে। ফলে তাদের আস্তানায় গড়ে উঠে কুসংস্কার ও বেদাতের আকড়া। মানুষ আল্লাহর কাছে ছেলে সন্তান না চেয়ে পীর বাবার কাছে ছেলে সন্তান চায় কিংবা রোগ মুক্তির কামনা করে। যা ইসলামী শরীয়তে শিরক হিসেবে পরিচিত। এ শ্রেণীর পীর, ফকির হলো রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদের বাহক। এদের দিয়ে কি পরিমাণের দ্বীন ইসলামের ক্ষতি হচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

## রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদের সুফল

এর কোন ব্যাপক সুফল সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে কিছু যে নেই তা অস্বীকারও করা যাবে না। কিন্তু যেটুকু আছে তা হলো দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ। এদের ব্যক্তিগত জীবনে নিজেদের চাল-চলনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী লেবাছ থাকে। তারা এটার দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ করে নেয়। অপরদিকে তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদী থাকায় তাগুতি শক্তির বিরোধিতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পথ চলতে পারেন। এটাই তাদের জন্য বড় সুফল। তাগুতি শক্তি তাদেরকে দান, খয়রাত, হাদিয়া, মানত দেয়। বড় হুজুরের ন্যায় সম্মান করে। ভাড়া করে নিয়ে কবর জিয়ারত করায়। চাল্লিশায় দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়। এগুলোই হলো তাদের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ।


www.pathagar.com

**রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদের কুফল**

রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদে বিশ্বাসীগণ তারা নিজেরা বুঝছেন না তাদের এ কর্মকাণ্ডে দ্বীন ইসলামের কি পারিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া যারা সাধারণ পাবলিক তারাও এ ব্যাপারে একেবারেই নির্বোধ। ইসলামী লেবাছ পরে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদীগণ যখন তাদের মিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্বোধ শ্রেণীর মানুষের কাছে যান তখন তারা এটাকেই দ্বীনের সহীহ পথ হিসাবে গ্রহণ করেন। কারণ তাদের ভাল-মন্দ ফারাক বা পৃথক করার কোন বোধ শক্তি নেই। ফলে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদীগণ নিজেরা যেমন ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছেন তেমনি নির্বোধ শ্রেণীর জনসাধারণকে তাদের দলে টেনে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শরীক করছেন। এতে করে দ্বীনি বিশ্বাসে নতুন নতুন ফেরকা যোগ হচ্ছে। অপরদিকে মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে, দ্বীনের কিছু কাজ (নামাজ, রোজা, হজ্জ, লম্বা দাড়ি, পাঞ্জাবী, টুপি ইত্যাদি) করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। যেমন কিছু কিছু (সব নয়) কওমী মাদ্রাসার শিক্ষিত লোক মনে করছেন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ওজু, গোসল, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি ঠিকঠিক মত পালন করলেই আখেরাতে নাজাত পাওয়া যাবে। দ্বীনে হককে বিজয়ী করার আন্দোলনের কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা সাধনা করা আমাদের জন্য জরুরি নয়। এ জন্য তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে থাকেন নিষ্ক্রিয়। ফলে জনগণ মনে করে ধর্মে রাজনীতি থাকলে তো মাদ্রাসার হুজুররা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতেন। অর্থাৎ তারা মসজিদসহ মাঠে ময়দানে ইসলামী রাজনীতির কথা বলতেন। কিন্তু তারা যেহেতু এ ব্যাপারে সক্রিয় নয় বা কোন কর্মসূচী নিয়ে দলগতভাবে কিছু বলেন না সুতরাং ধর্মে রাজনীতি থাকলেও তা পালন করা জরুরি নয়। ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন মতবাদের পিছনে ছুটে যায়। এ ক্ষেত্রে হুজুরগণ রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদী থাকায় দ্বীন ইসলামের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না। বর্তমান বিশ্বে দাওয়াতের কাজে পরিচিত দলটির নাম হলো তাবলীগ জামায়াত। এটিও এক ধরনের রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদপন্থী দল। তারাও ধর্মচর্চাতে রাজনীতির কোন গুরুত্ব দেন না। ফলে এদের কর্মকাণ্ড দ্বারাও দ্বীনে হকের আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। তাই 'তাবলীগ জামায়াতের অন্তারালে' এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে-১

তাবলীগ জামায়াত ধর্মচর্চাতে রাজনীতির কোন ধার ধারে না। এ জন্য এদের ধর্মকাণ্ডকে বলা হয়েছে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। অর্থাৎ তারা দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামী রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন। তাদের ছয় উছুলের মধ্যে এ ধরনের কোন প্রোগ্রাম নেই। সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে যারা ইসলাম সর্ম্পকে একেবারেই অজ্ঞ তারাই বেশি চিল্লায় যান। আবার স্কুল-কলেজের ইংরেজী শিক্ষিত


www.pathagar.com

লোকগণও চিল্লায় গিয়ে থাকেন। এখানে গিয়ে সাধারণ লোকগণ ও স্কুল-কলেজের শিক্ষিত লোকেরা ওজু, গোসল, নামাজ, কালাম ইত্যাদি শিখে থাকেন। এটা খুবই ভাল দিক বটে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এসে যখন তারা ইসলামী রাজনীতির ধার ধারেন না কিংবা উল্টো ইসলামের বিপক্ষের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন তখন ইসলামের ব্যাখ্যাটা মানুষের মনে এভাবেই দানা বাঁধতে থাকে। অর্থাৎ মানুষ মনে করে ধর্মের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের বিধানের আংশিক কিছু অনুষ্ঠানাদি (নামাজ, রোজা) পালন করে, রাজনীতির বেলায় যে কোন মতবাদ বিশ্বাস করাতে কোন অসুবিধা হবে না। চাই সেটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা কমিউনিজম যেটিই হোক না কেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে তাদের জীবন ব্যবস্থার অর্ধেক মানুষের তৈরি মতবাদের পিছনে ব্যয় হয়। এতে করে তাদের পক্ষে ৯০ চিল্লা দেয়ার পরও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করা হয় না। অপরদিকে তাবলীগের মুরব্বীগণ এমন অজিফা ঢুকিয়ে দেন, যা থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনা যায় না। সে অজিফাটা হলো- তাবলীগ জামায়াতের কাজটাই একমাত্র নবীআনা কাজ ও নাজাতের পথ। এই মন্ত্র যাদের দিলে একবার ঢুকে পড়েছে তারা মনে করে সব মানুষ যেদিন আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে সেদিন দ্বীন চমকে যাবে। কিন্তু এটা যে কিয়ামতের আগেও হবে না এ কথা তাদের বুঝানো যায় না অর্থাৎ কিয়ামতের আগে যখন দুনিয়া ধ্বংসের আলামত শুরু হবে তখনই সমস্ত মানুষের জ্ঞানে আল্লাহর সম্পর্কে বোধশক্তি জাগবে। তাছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাওয়ার আশা করা ঠিক হবে না। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সবর্দা মগজে এ চিন্তা রেখে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে।

তাবলীগ জামায়াতের লোকজন সৎকাজের অনুরোধ করলেও অসৎকাজের নিষেধ এবং তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করেন না। অপরদিকে তারা জিহাদের অপব্যাখ্যা (চিল্লায় বের হওয়াকে জিহাদ বলে) করে মূল জিহাদী চেতনাকে নিস্তেজ করে দেয়।

আল্লাহ বলেন- 'তেমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে, আর মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে। এমন লোকেরাই হবে সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল-সম্পদকে তাঁর জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আর তারা যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা (দুশমনদেরকে) মারে ও নিজেরা মরে।' (তাওরাহ ১১১)

'তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো আল্লাহ (পরীক্ষা করে) দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।' (আলে ইমরান-১৩৮)

আল্লাহ যে সব কাজের মধ্যে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সফলতা রেখেছেন তন্মধ্যে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি


www.pathagar.com

তাবলীগ জামায়াতের ছয় উছুলে নেই। অথচ তারা এটাকেই (ছয় উছুলকে) নবীআনা কাজ ও নাজাতের পথ মনে করে। এ জন্য এদেরকে বলা যায় চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তশীল মুসলমান। তাবলীগের মুরব্বীগণ বাড়তি একটি কাজ করেন তাহলো তারা সেক্যুলার রাজনীতি করতে নিষেধ না করলেও ইসলামী রাজনীতি এবং কোরআনের তাফসীর মাহফিলে যেতে নিরুৎসাহিত বা নিষেধ করেন। ফলে তাবলীগ জামায়াতের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, অজু গোসল, জিকির-ফিকির ইত্যাদি করার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে যার যা মনে চায় করো বাধা নেই তবে ইসলামী রাজনীতি করা যাবে না। এতে করে মানুষ মনে করে এটা তো সুবিধাজনক পথ এভাবে ধর্মকর্ম পালন করতে অসুবিধা কিসের? যারা তাগুতি শক্তি তারা তো নাকোশ হয় না বা বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে না। দ্বীন ইসলামের মুষ্টিমেয় কিছু রীতি-নীতি পালন করলে যেহেতু কাল হাশরে নাজাত পাওয়া যাবে সুতরাং গাট্টি নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ধর্ম-কর্ম পালনে বের হওয়াই শ্রেয়। এর চেয়ে নিরাপদ পথ তো আর কোনটাই নয়। মানুষের বিশ্বাসে এ রকম ধারণা সৃষ্টি হওয়াই তাবলীগ জামায়াতের বড় কুফল। আমি নির্বাচনের আগে কয়েকবার চিল্লা দিয়েছেন এমন একজন তিন চিল্লার সাথীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সমস্ত বাংলাদেশে আপনাদের কতজন তিন চিল্লার সাথী আছে? তিনি বললেন-অনেক.....। মানে অসংখ্য। আমি বললাম আপনারা সবাই মিলে যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন তাহলে তো খুব সহজেই এ দেশে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো। আমার কথাটি শুনে তিনি নাউজুবিল্লাহ পড়ে বললেন, আমরা রাজনীতি করি না। আরও বললেন- সকল মানুষ যেদিন আল্লাহর রাস্তায় নেমে পড়বে তখন এমনি এমনি দ্বীন চমকে যাবে। পাঠক বন্ধুগণ বলুনতো, তিনি যে নাউযুবিল্লাহ পড়লেন আমি কি কোন খারাপ কথা বলেছি? মানলাম তারা কোরআনের রাজনীতির কথা বলেন না কিন্তু সেক্যুলার রাজনীতি করার ব্যাপারে কি নিষেধ করেন? আমি এ পর্যন্ত কোথাও পাইনি কোন তাবলীগওয়ালা ভাই চিল্লা থেকে এসে সেক্যুলার রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। তাছাড়া এর আর একটি ক্ষতিকর দিক হলো এটি রাসূল (সা.)-এর সঠিক দাওয়াতী পদ্ধতি নয়। তবু এটাকেই তারা নবীআনা কাজ দাবী করছেন এবং মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন। আবার অনেকেই এটাকে নবীআনা কাজ মনে করে জীবন চিল্লা পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছেন। যা নবীআনা কাজ নয় তাকে নবীআনা কাজ বলা এবং সেই নিয়তে আমল করা নবীর সুন্নতের খেলাফ। এমন কাজকেই বলা হয় বেদ'আত। দাওয়াত ও তাবলীগ নবী-রাসূলগণের জীবনের প্রধান মিশন। কিন্তু সে কাজটা নবী, রাসূল (সা.) দের পদ্ধতিতেই করতে হবে। তবেই এটাকে নবীআনা কাজ বলা যাবে। নবী, রাসূল (সা.) গণ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করা সহ প্রচলিত বাপ-দাদার জাহেলী রীতি-নীতি, রসম রেওয়াজ এবং মনগড়া রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদি সকল কিছুকে একই সাথে অস্বীকার করেছেন। তাগুতি শক্তি হলো তারা যারা আল্লাহর


www.pathagar.com

আইন মানে না এবং অন্যদেরকে মানতে নিষেধ করে। আবার যারা আল্লাহর আইন মানার দাওয়াত দেয় তাদেরকে বাধা দেয়। সুতরাং তাগুতি শক্তির ভয়ে শুধু সৎকাজে আদেশ দেয়া নবীআনা কাজের সহি তরিকা নয়। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন- যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে না তারা আমার উম্মত নয়। সুতরাং অসৎকাজে (আল্লাহর আইনের বিরোধী সকল কাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানুষের মনগড়া আইন) নিষেধ করা থেকে দূরে সরে থাকা মানে রাসূলের (সা.) উম্মত হওয়া থেকে দূরে সরে যাওয়া। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বলেছেন।

অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না নিয়ে অসৎকাজ নির্মূল করা কোন অবস্থায় সম্ভব নয়। আবার কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করতে হলে ইসলামপন্থীদের অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে হবে। শুধু শুধু তেলাওয়াতের জন্যই আল্লাহ কোরআন নাজিল করেননি। কোরআনে অনেক ইসলামী আইন রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আমি একজন হাফেজে কোরআনকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম আপনি কত দিন ধরে হাফেজ হয়েছেন? তিনি বললেন- পাঁচ বছর। আবার জিজ্ঞেস করলাম- আপনার হুজুর কত বছর ধরে হাফেজ হয়েছেন- তিনি বললেন ৩০ বছর। আমি বললাম সূরা নূর (আয়াত ২)-এ বলা হয়েছে, 'ব্যভিচারী পুরুষ ও মেয়ে লোক তাদের প্রত্যেককে এক'শ করে দোররা মারো।' কিন্তু আপনি এবং আপনার হুজুর ত্রিশ বছরের মধ্যে এ ধরনের আইনের মাধ্যমে কোথাও কোন বিচার প্রত্যক্ষ করেছেন কি? জবাব না দিয়ে বললেন- এটা তো রাষ্ট্রের কাজ। আমি বললাম তা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে যারা কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করতে চায়, জনগণকে কি তাদের ভোট দিতে বলেছেন? এ ধরনের কোন প্রোগ্রাম কি আপনাদের আছে? সকল প্রশ্নের জবাবই এড়িয়ে যাওয়ার মতো। মনে হলো এটা তাদের কোন কাজ নয়। এতো বড় কোরআন তারা মুখস্ত করেছে এটা কি সাধারণ কথা। নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাধনার ব্যাপার। কিন্তু কোরআন কি শুধু মুখস্ত করে দীলে ভরে রাখার জন্য এসেছে? নিশ্চয়ই নয়। একে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য। পাঠক বন্ধুগণ, বলুন তো কোরআন কি শুধু তেলাওয়াত করেই নূরের টুপি পাওয়া যাবে? এ ব্যাপারে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি সেটি হলো একজন ডাইরিয়ার রোগী চিকিৎসা নিতে এসেছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সাব খাবার সেলাইন তার হাতে দিয়ে বললেন- প্রতিটি প্যাকেট আধা সের পানিতে গুলিয়ে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর একগ্লাস করে খাবেন। এবার রোগী সেলাইন নিয়ে বাড়ীতে এসে সেলাইনের প্যাকেট হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন- একটি প্যাকেট আধা সের পানিতে গুলে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর একগ্লাস করে খেতে হবে। একথাই শুধু বলতে লাগল। আর বার বার পায়খানায়ও যেতে লাগল। কিন্তু একটি সেলাইন পানিতে গুলিয়ে কখনো খেয়ে দেখল না। এতে তার অবস্থা আস্তে আস্তে আরও খারাপ হতে লাগল। অবশেষে


www.pathagar.com

পানি শূন্যতা হয়ে যখন মারা যাওয়ার উপক্রম হল তখন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা নিয়ে এল আবার ঐ ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে বলল- কি ব্যাপার! তাকে তো ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছিল! সে কি ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সেলাইন সেবন করেনি? তখন রোগী বলল- জী, ডাক্তার স্যার-আপনি যে কথা বলেছেন- আমি সে কথা সেলাইনের প্যাকট হাতে নিয়ে অনেক বার মন দিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এখন আমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছি। আমাকে বাচাঁন। এ কথা শুনে ডাক্তার সাহেব ক্ষেপে ধমক দিয়ে বললেন- বেয়াকুফ, আমি কি সেলাইনের প্যাকেট হাতে নিয়ে তার ব্যবহার বিধি শুধু পড়তে বলেছি! এটা পানিতে গুলিয়ে বাস্তবে ব্যবহার না করলে কি উপকার আসবে। এভাবে কি রোগ যাবে, না রোগ বাড়বে? মূলত এভাবে রোগ বাড়ারই কথা। পাঠক বন্ধুগণ বলুন তো যারা শুধু কোরআন পড়ছে এবং নামাজ রোজা নিয়েই ব্যস্ত, কখনো কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে না তারা কি আল্লাহর ধমক খাবেন না। নিশ্চয়ই খাবেন। কারণ আল্লাহ শুধু কোরআন পড়ার জন্য নাজিল করেননি। কোরআনের আইন সমাজে বাস্তবায়ন করাই হলো আল্লাহর উদ্দেশ্য।

তাবলীগ জামায়াতে যেমন নামাজ, রোজা ও কোরআন পড়ার তাগিদ দেয়া হয় কিন্তু কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয় না তেমনি আমাদের দেশে কিছু মাদ্রাসা আছে যেখানে শুধু মাওলানা ও হাফেজ বানানো হচ্ছে। কিন্তু কোরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনী আইন বাস্তবায়ন করার কোন প্রোগ্রাম তাদের মধ্যে নেই। এতে করে ত্রিশ বছর পর্যন্ত যারা হাফেজী শিক্ষকতা করছেন, তাদের মধ্যে কোরআনের আইন বাস্তবায়ন করার কোন চেতনা লক্ষ্য করা যায় না। এবার ভেবে দেখুন আল্লাহ কি এসব তাবলীগওয়ালা ভাইদের এবং হাফেজ মাওলানাদের মাথায় নূরের টুপি পরাবেন, না ধমক দিবেন। সেই বিচারের দায়িত্ব আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। যারা নেকীর আশায় জীবনকে এ সব কাজে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন তাদের চেষ্টাটা নিষ্ফল হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেয়া হলো। একজন মা দশ মাস দশ দিন পেটে সন্তান রেখে কতই না কষ্ট করে। কিন্তু যখন তার গর্ভ থেকে মৃত সন্তান প্রসব হয় তখন তার সমস্ত চেষ্টা ও কষ্ট বৃথা যায়। মৃত সন্তান যাতে মায়ের ভুলের জন্য না হয় সেজন্য মাকে অবশ্যই প্রসবকালীন জটিলতা সম্পর্কে জানতে হবে। অপরদিকে সুস্থ্য সন্তান পাওয়ার জন্য জীবন পদ্ধতির ভাল দিকটাই অনুসরণ করা দরকার। কিন্তু তা না করে যদি মনগড়া জীবন চালিয়ে দেয়া যায় তবে তো অবশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য বৃথা হয়ে যাবে। কিংবা কেউ যদি বিষকে ঔষধ মনে করে সেবন করে তবে তার মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব যারা মনগড়াভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মচর্চা করছেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বৃথা যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ম-থেকে রাজনীতি এবং রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা না করে আসুন আমরা আল্লাহর নীতি রাজনীতি বা আল্লাহর মনোনীতি ধর্ম ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হই। আমি


www.pathagar.com

তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে কি চর্চা হচ্ছে এবং এতে সমাজ ধর্ম কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে এ সর্ম্পকে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা করেছি। যা আমাদের সকলের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

## তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে -২ প্রশ্নোত্তর পর্ব

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত কি বেদ'আতী কোন দল?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াত বেদ'আতী কোন দল কিনা সে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব হাক্কানী আলেমগণের। আমি শুধু দেখাচ্ছি তারা দ্বীনের কতটুকু অংশ মানে আর কতটুক অংশ মানে না। তবে দ্বীনের কিছু অংশ মানা এবং কিছু অংশ না মানা যেমন বড় অন্যায় তেমনি নেকীর আশায় ইসলামী বিধানে নতুন কিছু সংযোগ কিংবা পরিবর্তন করাও বড় পাপ। নবীজী (সা.) যা নিজে করেনি কিংবা অন্যকে করতে বলেননি, এমন কাজ সওয়াবের আশায় করার নামই হলো বেদ'আত। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ডে উভয়গুলোরই সমাবেশ রয়েছে। অর্থাৎ তারা দ্বীনের কিছু অংশ মানে এবং কিছু অংশ মানে না (ইসলামী রাজনীতির ধারধারে না)। অপরদিকে তারা দ্বীনের কাজ হিসেবে ইসলামী বিধানে নতুন কিছু সংযোগ করেছেন, সেগুলো হলো- চিল্লা প্রথা কিতাবী তালিম (ফাজায়েলে তাবলীগ) দেয়া ইত্যাদি। অথচ কোরআনের তাফসীর পড়ার কোন তাগিদ তাদের মাঝে নেই। অপরদিকে তারা সাধারণ লোকের স্বপ্ন গুরুত্বের সাথে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী দ্বীনি আমল করা জরুরি মনে করে। সুতরাং এটা বেদ'আতী দল কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অতএব গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখুন। নিজে আমল করুন এবং অপরকে আমল করতে বলুন।

**প্রশ্ন ঃ** সত্যের মাপকাঠি যদি আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ধরি তবে কি তাবলীগ জামায়াতের উছুলী রীতি-নীতি বৈধ হবে?

**উত্তর ঃ** সত্যের মাপকাঠি কি এবং সত্যের মাপকাঠি হিসেবে কাকে মানা একমাত্র বৈধ, সে কথা যুক্তি প্রমাণসহ 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) একমাত্র সত্যের মাপকাঠি ও শেষ নবী কেন?' সে অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। নবী-রাসূলগণ ছাড়া দ্বীনের কোন বিধান বা রীতি-নীতি চালু করা অন্য কারও পক্ষে যেমন বৈধ নয় তেমনি তাদের রীতি-নীতি অন্যদেরও মানা বৈধ নয়। এ অর্থে তাবলীগ যেহেতু দ্বীনের কিছু অংশ ছেড়েছে এবং নতুন কিছু সংযোজন করেছে সুতরাং তাদের রীতি-নীতি মানা কতটুকু বৈধ হবে ভেবে দেখুন।

আল্লাহ বলেন- 'রাসূল (সা.) তোমাদের সামনে যা উপস্থাপন করেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যে সব কিছু তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক।' (হাশর-৭)

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত কি ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা মনে করে?

**উত্তর ঃ** তাদের কর্মকাণ্ড দেখে এরকমই মনে হয়। তাবলীগের ছয় উছুলের কোথাও রাজনীতির কথা নেই। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনীতি একই


www.pathagar.com

জিনিস। তাদের ধর্ম চর্চার নাম 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। এটাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতোই একটা মতাদর্শ।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বৈধ মনে করে?

**উত্তর ঃ** মনে হয় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ তাদের দৃষ্টিতে বৈধ। কারণ তাবলীগ জামায়াত থেকে এসেও দেখা যায় যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিল তারা সেখানেই থেকে যায়। এমনও দেখা যায় চিল্লা থেকে এসে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে তারা আরও সক্রিয় হয়ে যায়। অনেকে নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলের থেকে প্রার্থী হয়। এসব বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় তাবলীগ জামায়াত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বৈধ মনে করে।

**প্রশ্ন ঃ** সেক্যুলার রাজনীতি যারা করে তারা তাবলীগ জামায়াত থেকে এসেও তা রদবদল করে না কেন?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচীতে সেক্যুলার বিশ্বাস পরিবর্তন করার কোন উছুল নেই। তাই তাবলীগ জামায়াত থেকে এসেও কেউ সেক্যুলার বিশ্বাস পরিবর্তন করে না। অপরদিকে তাবলীগ জামায়াতের মতাদর্শও এক ধরনের মানব রচিত মতবাদ। এটা হলো 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের রচিত কোন মতবাদই আদর্শগত দিক থেকে একটার দ্বারা অন্যটা বাধার সম্মুখীন হয় না। তবে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব হলো কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে আদর্শের কোন দ্বন্দ্ব নেই।

**প্রশ্ন ঃ** দ্বীন হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। কিন্তু তাবলীগ জামায়াত ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলে না কেন?

**উত্তর ঃ** তারা রাসূলুল্লাহর (সা.) সঠিক দ্বীনের উপর থাকলে তা অবশ্যই বলতো। মূলত তারা দ্বীনের কিছু অংশ মানে ও মানার দাওয়াত দেয়। কিন্তু জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করার মতো বিষয়গুলো তারা এড়িয়ে চলেন। তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন এক দর্শন প্রচার করছেন। এ দর্শনে রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণের কোন কর্মসূচী নেই। তাই তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতের লোকজনকে বাতেল শক্তি বাধা দেয় না কেন?

**উত্তর ঃ** এর মূল কারণ হলো তারা বাতেল বা তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করে না। পাশাপাশি তারা বাতেল বা তাগুতি শক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এ কারণে বাতেল শক্তি বিভিন্ন সময় তাবলীগ জামায়াতের লোকজনের কাছে দোয়া আনতে যায়। তাবলীগ জামায়াত দ্বীনকে বাতেলের সাথে এমন ভাবে মিলিয়ে ফেলেছে যাতে বাতেলের গাঁয়ে শিহরণও আসে না। তাই বাতেল শক্তি তাবলীগ জামায়াতের কাজে বাধা দেয় না। মূলত তাদের দাওয়াত হক হলে বাতেল অবশ্যই


www.pathagar.com

বাধা দিত। হক ও বাতেলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব যেখানে নেই সেটাকে হক মনে করা ঠিক নয়। রাসূল (সা.) বলেন- 'শেষ যুগে কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে; যারা দ্বীনকে দুনিয়ার সাথে মিলিয়ে ফেলবে। তারা লোকদের দেখানোর জন্য নরম ভেড়ার চামড়ার কাপড় পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা মধুর চেয়েও মিষ্ট হবে কিন্তু তাদের অন্তর হবে নেকড়ের অন্তরের মত হিংস্র। মহান আল্লাহ বলেন-'তারা আমার ব্যাপারে ধোকায় পড়েছে, নাকি আমার উপর চড়াও হচ্ছে, আমি নিজের কসম খেয়ে বলছি, তাদের উপর ফেতনা প্রেরণ করবো, যার ফলে তাদের সম্মানিত লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।' (তিরমিযী পরহেজগারী অধ্যায়)

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত জিহাদের ব্যাখ্যাকে মেহনত বা নফসের জিহাদ বলছে, এটা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ** জিহাদ হলো বাতেলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা বাতেলকে অপসারণ করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টার নাম। কিন্তু তাবলীগ জামায়াত জিহাদের অর্থকে বিকৃত করে বলছে- দ্বীনের মেহনত এবং আত্মশুদ্ধি। ইসলামী পরিভাষার নতুন মন গড়া অর্থ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করাই হলো বেদ'আত। এটা সত্যিকার জিহাদ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করারই প্রচেষ্টা। সুতরাং জিহাদের এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা মোটেও ঠিক নয়। রাসূল (সা.) বলেন 'তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে অবশ্যই অনেক মত পার্থক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার পথ এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদার পথ-অনুসরণ করবে। তাকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। আর নব আবিষ্কৃত বিষয় হতে সাবধান। কেননা প্রত্যেকটি নব আবিষ্কৃত বিষয়ই হল বিদাত এবং বেদ'আতের স্থান হল জাহান্নাম।' (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা)

**প্রশ্ন ঃ** ইবাদত হালাল, হারাম ইত্যাদি প্রণয়ন এবং আদেশ নিষেধ করার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতের উছুলে কিছু বাড়তি কাজ আছে যেমন হালকা যিকির, চিল্লা প্রথা, কাশফ, কিসসা কাহিনী, স্বপ্ন ইত্যাদি বাড়তি কাজগুলো বিশ্বাস করে আমল করা কি জরুরি? কিংবা এগুলো আমল করলে কি সওয়াব হবে?

**উত্তর ঃ** রাসূল (সা.) হলেন সত্যের মাপকাঠি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের মাধ্যমে কোনটি হালাল কোনটি হারাম তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং ইবাদতের পন্থাগুলো বলে দিয়েছেন। অপরদিকে রাসূল (সা.) বাস্তবে তা করে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রাসূল (সা.)-এর কাজ কর্ম আদেশ, নিষেধ হাদীসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। রাসূল (সা.) ব্যতীত অন্য কেউ দ্বীনের কোন প্রথা উদ্ভাবন করার অধিকার রাখে না। রাসূল (সা.) প্রর্বতন করেন নাই, এমন কোন দ্বীনি প্রথা, আদেশ, নিষেধ দ্বীনের ক্ষেত্রে সওয়াবের আশায় করার নাম বেদ'আত। সুতরাং বেদ'আতী পন্থায় আমল করলে সওয়াব হওয়ার কথা নয়। বরং এটি দ্বীনে হকের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। ঔষধ মনে করে বিষ খেলে যেমন শারীরিক ক্ষতি হয় তেমনি বেদ'আতী আমল করলে সওয়াব না হয়ে পাপই হবে।


www.pathagar.com

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত নৈতিক চরিত্র সংশোধনের দাওয়াত দিতে দেখেছি। কিন্তু তারা আকিদা সংশোধনের দাওয়াত দেয়নি কেন?

**উত্তর ঃ** রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কী জীবনে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত দিয়েছেন। আর মাদানী জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ পাক কোরআনের সূরা গুলোও এভাবে নাজিল করেছেন। মক্কী জীবনের প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহীদের। তাওহীদের মূল কথা হলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ হলেন একমাত্র হুকুমদাতা, বিধানদাতা, রিজিকদাতা, ইত্যাদি। এর মূল বাণী হলো এই আকাশ যমীন আল্লাহর। তাই যমীনের আইন হবে আল্লাহর। তাবলীগ জামায়তে নামাজ, রোজা, হজ্ব, অযু-গোসল ইত্যাদির দাওয়াত দিলেও রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষের মনগড়া আইন যে চলতে পারে না সে কথা বলে না। এর ফলে তাবলীগে তিন চিল্লা দিয়ে এসেও তারা সেক্যুলার রাজনীতি করে। তাবলীগ জামায়াত মানুষের তৈরি অন্যান্য মতবাদের ন্যায় (ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, মাওবাদ, লেলিনবাদ, জাতীয়তাবাদ) এটিও একটি মানব রচিত মতবাদ। এটি হলো 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদ'। সুতরাং তাবলীগ জামায়াত মানব রচিত মতবাদ বলে এতে আকিদাগত সমস্যা রয়েছে। কারণ মানব রচিত মতবাদ হলো আপেক্ষিক।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত মসজিদে কুরআন ও হাদীসের তালিমের কথা না বলে কিতাবী তালিমের কথা বলে কেন?

**উত্তর ঃ** এ ব্যাপারটি নিয়ে আমিও ভেবে থাকি। যেখানে দ্বীনি আকিদার মূল উৎস হলো- কুরআন ও হাদীস সেখানে তারা এগুলোর তালিম না দিয়ে কিতাবী তালিমের কথা বলে কেন? যতটুকু বুঝা যায় তাহলো তাবলীগের নেসাবের বইয়ে তাদের মুরব্বীদের কথা ও হেদায়েত রয়েছে। এগুলো প্রচার করার জন্যই তারা কিতাবী তালিমের কথা বলে। এখানে মুরব্বীদের কথা ও হেদায়েত হলো মানব রচিত মতবাদের একটি অংশ। এটিই মানুষকে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদের দিকে ধাবিত করে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো কুরআন সকল মানুষের পক্ষে বুঝানো এবং বুঝা কঠিন তাই তারা কুরআনের তালিম দেন না। তাদের এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েতের গ্রন্থ কঠিন করে নাজিল করেননি। আল্লাহ নিজেই কুরআন পাকে এটি যে সহজ করে নাজিল করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাবলীগের মুরব্বীগণ এ কথা বললে ঠিক বলেননি। অপরদিকে তারা কোন সরাসরি হাদীস গ্রন্থেরও (বোখারী শরীফ, তিরমিজি শরীফ) তালিম দেন না। তাই বিষয়টি রহস্যজনক।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত তাগুত বা খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রাখে?

**উত্তর ঃ** যতটুকু দেখা যায় তাবলীগ জামায়াত তাগুতকে অস্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে বরং তারা তাগুতকে সঙ্গে নিয়েই দাওয়াতের কাজ করে। যেমন যারা


www.pathagar.com

আল্লাহর আইন চায় না এবং সেক্যুলার রাজনীতি করে তারা তাবলীগ জামায়াতে চিল্লা দিয়ে এসেও নির্বাচনের সময় সেক্যুলার দল থেকে প্রার্থী হয়। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাবলীগ জামায়াত তাগুতকে পরিহার করে না বরং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

মহান আল্লাহ বলেন- 'আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (খোদাদ্রোহী শক্তিকে) পরিহার করে।' (সূরা নাহল-৩৬)

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়তে কি তাগুতকে অস্বীকার করতে বলে? চিল্লায় গিয়ে কেউ যদি তাগুতকে অস্বীকার করতে বলে তখন মুরব্বীরা কি করে?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীগণ কখনো তাগুতকে অস্বীকার করতে বলে না। অপরদিকে কেউ তাদের সাথে বের হয়ে তাগুত সর্ম্পকে কিছু বলুক তাও তারা চায় না। কিন্তু কেউ যদি চিল্লায় বের হয়ে তাগুতকে অস্বীকার করতে বলে তবে মুরব্বীগণ তার উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। এবং তাকে চিল্লা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত তাগুতের নির্যাতন থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বণ করছে তা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ** দাওয়াত ও তাবলীগের শর্ত হলো- যে কেউ সত্য দ্বীনের উপর ঈমান আনবে তা সে নিজে বিশ্বস্ত মন নিয়ে বিশ্বাস করে নিতে হবে। তারপর নিজে দ্বীনের পরিপন্থী সকল কিছু পরিহার করতে হবে। তা যদি বাপ-দাদার ধর্ম কিংবা প্রচলিত রসম-রেওয়াজ যাই হোক অথবা গোত্র ও সাম্প্রদায়িক বন্ধনই হোক। কিংবা নিজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বার্থই হোক। অতঃপর অন্যদের কাছেও সমভাবে তা গ্রহণ ও পরিহার করার দাওয়াত দিতে হবে। এটা করতে গিয়ে সামনে বিপদ আসলেও তা কাটছাট করা যাবে না। অর্থাৎ কোন রূপ তিরস্কার অথবা বিরোধিতার ভয়ে এর থেকে কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না। এ শর্ত পূরণ করার জন্য আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবানকারী প্রয়োজনে নিজের জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই হলো দাওয়াত ও তাবলীগ বা দ্বীন প্রচারের শর্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ভাবেই দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে রাসূল (সা.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকেও এভাবেই দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন- 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌছে দাও। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তুমি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না। লোকদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন।' (সূরা মায়েদা-৬৭)

'অতএব তুমি সেই দ্বীনের দিকে দাওয়াত দাও এবং তোমাকে যেমন হুকুম করা হয়েছে– সেই দ্বীনের ওপর অবচল থাক। কিন্তু এই লোকদের কামনা বাসনার অনুসরণ করো না। তুমি বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার ওপর ঈমান এনেছি।' (সূরা শূরা -১৫)


www.pathagar.com

অতঃপর বলা যায় তাবলীগ জামায়াত যেহেতু দ্বীনের ক্ষেত্রে কাটছাট করেছে সুতরাং দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের এ নীতি বৈধ নয়।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না এবং অন্যায় করতে নিষেধও করে না। এ কারণে ঢাকার কাকরাইল মসজিদের পাশের রমনা পার্কে যে সব অশালীন কাজ হয় সেটিরও কোন প্রতিকার হয় না।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীদের মুখে স্বপ্ন, কারামত, কিস্‌সা-কাহিনী ইত্যাদি শুনা যায় এগুলো বিশ্বাস করা কি শরীয়ত সম্মত?

**উত্তর ঃ** এগুলো এক ধরনের কুসংস্কার ও বেদ'আত। এ ধরনের কিস্‌সা-কাহিনী ও স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করা আলেমে দ্বীনের দৃষ্টিতে শরীয়ত সম্মত নয়।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত তো মন্দ কাজে নিষেধ করে না এবং তাগুতকে পরিচয় করিয়ে দেয় না এতে তাদের আমলের অবস্থা কি হবে?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, অন্যায় করতে নিষেধও করে না। এটাকে তারা হেকমতের খেলাপ মনে করে। অপরদিকে তারা তাগুতকে অস্বীকার করে না এবং জনসমক্ষে তুলে ধরে না। কেউ তাগুত সর্ম্পকে কিছু বলুক এটাও তারা চায় না। কেউ বললে তাদের প্রতি ক্ষেপে দল থেকে বের করে দেয়। যুগে যুগে যারা মন্দ কাজের প্রতিবাদ করেনি তাদেরকে আল্লাহ ভর্ৎসনাই করেছেন। সুতরাং তাবলীগ জামায়াতের আমল আল্লাহর দৃষ্টিতে কি হবে তা আপনারাই ভেবে দেখুন। দেখুন এ ব্যাপারে আল্লাহ কি বলেছেন।

আল্লাহ বলেন- 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।' (সূরা মায়েদা-৭৮-৭৯)

'আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে তোমারা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে (খাদাদ্রোহী শক্তিকে) পরিহার করো।' (সূরা নাহল-৩৬)

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতে বড় ভুলগুলো কি কি?

**উত্তর ঃ** ১। তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ছয় উছুল ও চিল্লা প্রথার যে বিধান চালু করেছেন এটি বেদ'আত। এর কারণ হলো রাসূল (সা.) হলেন সত্যের মাপকাঠি, তাই তিনি ব্যতীত অন্য কেউ দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোন বিধান বা প্রথা কিংবা রসম-রেওয়াজ চালু করার অধিকার রাখেন না। এ অর্থে ছয় উছূল ও চিল্লা প্রথা আবিষ্কার বড় ধরনের ভুল।

আল্লাহ বলেন-রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' (সূরা হাশর-৭)


www.pathagar.com

২। তারা কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না এবং অন্যায় করতে নিষেধও করে না।

৩। তারা তাগুতকে (যারা আল্লাহর আইন চায় না এবং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের বাধা দেয়) অস্বীকার করে না এবং তাগুতের পরিচয় জন সমক্ষে তুলেও ধরে না।

৪। তারা নিজেরা ইসলামী রাজনীতি করেন না এবং অন্যদেরকে ইসলামী রাজনীতি করতে উৎসাহিত ও করেন না। বরং তাদের কর্মকাণ্ড ইসলামী রাজনীতি করতে নিরুৎসাহিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ইসলামী রাজনীতি করতে নিষেধ করেন।

৫। তারা কখনো সেক্যুলার রাজনীতি করতে নিষেধ করেন না। বরং সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের সাথে তাদের সম্পর্ক বেশী থাকে।

৬। তাবলীগ জামায়াত কোরআনের তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ পড়তে উৎসাহিত করেন না। বরং কোরআনের তাফসীর মাহফীলে যেতে নিষেধ করেন।

৭। তারা তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচীকেই একমাত্র নবীআনা কাজ মনে করে এবং এটাকেই একমাত্র নাজাতের পথ ভাবে।

৮। তাদের দাওয়াতী পদ্ধতি নবী, রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতি নয়। তবু এটাকেই তারা একমাত্র নবীআনা কাজ দাবী করে।

৯। তারা শুধু আত্মশুদ্ধির দাওয়াত দেয়। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত দেয় না। তাওহীদের দাওয়াতের মূল কথা হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানতে হবে এবং তাগুতকে পরিহার করতে হবে।

১০। তাবলীগ জামায়াত শিরক ও বেদ'আতী কাজে বাধা দেয় না। যেমন কবর পূজা, মাজার পূজা ইত্যাদি। বরং তাদের মুরব্বীগণ কবরের নিকট যাতায়াত করতেন এবং তা থেকে কাশফ ও রূহানী ফায়েজ আশা করতেন।

১১। তারা তাবিজ কবজে বিশ্বাসী বলে শরীরে তা বেঁধে বা ঝুলিয়ে রাখেন।

১২। তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের ঘৃণা করেন।

১৩। তারা শুধু মাটির নিচের (কবরের) বয়ান বেশি করেন। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি, এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন না।

১৪। তারা দুনিয়ার সব মানুষ আল্লাহওয়ালা হলে দ্বীন চমকে যাবে এ কথায় বিশ্বাসী। যা কোন দিনও হবে না।

১৫। তারা জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং জিহাদকে নিরুৎসাহিত করেন। ইত্যাদি.....।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীগণ বলে সব লোক যেদিন চিল্লাওয়ালা হয়ে যাবে সেদিন এমনিতেই দ্বীন চমকে যাবে, এ কথাটা কি ঠিক?

**উত্তর ঃ** আমার মনে হয় পুরা কথাটাই বিভ্রান্তিজনক। কারণ দেখা যায় দেশ-বিদেশ থেকে চিল্লা দিয়ে এসেও সেক্যুলার দল থেকেই নির্বাচন করে। পৃথিবীতে কোন সেক্যুলার দলই আল্লাহর আইন চায় না। চিল্লায় গিয়ে যদি দ্বীন সর্ম্পকে তার


www.pathagar.com

বুঝে আসত তবে সে কখনো সেক্যুলার দল থেকে নির্বাচন করত না। তাই চিল্লাওয়ালা হলেই দ্বীন চমকে যাবে এ কথা বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

**প্রশ্ন ঃ** সূফীবাদ ও তাবলীগ জামায়াতে দৃষ্টিভঙ্গি কি এক?

**উত্তর ঃ** সূফীবাদে বিশ্বাসী লোকগণ দুনিয়ার উপরে বাস করে দুনিয়ার জিনিস খেয়ে সারা রাতদিন শুধু কবরের কথা বলে। দুনিয়া সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকে। দুনিয়ার বিচার, আইন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, লেন-দেন, সংস্কৃতি ইত্যাদি সর্ম্পকে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা শুধু নামাজ রোজা ও যিকির-ফিকিরে ব্যস্ত থাকে। দুনিয়াকে তারা পায়খানার জায়গা মনে করে এবং দুনিয়াবী কাজ কর্মকে তারা পাপ হিসেবে ভাবে। এ অর্থে তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকম। তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি, লেনদেন, বিচার ব্যবস্থা আইন-কানুন ইত্যাদি নিয়ে কোন কথা বলে না। শুধু নামাজ, রোজা, যিকির ও চিল্লা নিয়ে ব্যবস্থা থাকে। এতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা খোদাদ্রোহী শক্তির হাতে চলে গেছে। এ ব্যাপারে সূফীবাদীর যেমন মাথা ব্যথা নেই তেমনি তাবলীগ জামায়াতেরও কোন চিন্তার কারণ নেই। তাই সূফীবাদ ও তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই মনে হয়।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না কেন?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াতের মূলনীতিতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কোন উছুল নেই। তাই তারা অন্যায়কারীর মাথায় চুমু খেয়ে তাদের মন জয় করতে চায়। এ জন্য তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। কিন্তু তাদের এ পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল 'সত্য কাজে আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দেয়া।'

আল্লাহ বলেন- 'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতীর কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (সূরা আলে ইমরান-১১০)

এ জামায়াত নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতি অনুসরণ না করে এর প্রতিষ্ঠাতার প্রবর্তিত ছয় উছুলের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেহেতু ছয় উছুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কোন কর্মসূচী নেই তাই তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ডে লোকজনের এতো সমাগম কেন?

**উত্তর ঃ** কোন ভ্রান্ত পথ বা কাজ শয়তান বা আত্মার পক্ষ থেকে কখনও বাধাগ্রস্ত হয় না। একে বরং শয়তান ও বাতেল শক্তি জনসমক্ষে চাকচিক্যময় করে প্রকাশ করে। এদের গুণ সহজে মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তাবলীগ জামায়াতের কর্মকাণ্ডে লোক সমাগম বেশি হয়।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াত যে হকের উপর নেই এর প্রমাণ কি?

**উত্তর ঃ** আগেও অনেক প্রশ্নের উত্তরে বলেছি তাবলীগ জামায়াত নবী-রাসূলদের পন্থায় লোকদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছেন না। তারা যে হকের উপর নেই, এর বড় প্রমাণ হলো তাগুতি শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী ধর্মগুরুগণ তাদের মিত্র শক্তির


www.pathagar.com

ভূমিকায় অবস্থান করে। কারণ দাওয়াত হক হলে সমসাময়িক বাতেল রাষ্ট্রশক্তি ও উপরোল্লিখিত দলের লোকেরা বিরোধিতা করবেই। এটা চিরন্তন সত্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের অত্যাচার নিপীড়নে নবী-রাসূলগণও হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার উল্টো। অর্থাৎ তাবলীগ জামায়াতের মুরব্বীগণ চরম কাফেরের দেশেও দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছেন নির্দ্বিধায়। ভিসা দিতে কোন দ্বিধা করে না। কাফেররা তাদের দাওয়াতে নাখোশ হয় না। বরং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। বাটা সু কোম্পানীর জুতায় যেখানে আল্লাহর নাম লিখে সেখানে তারা টঙ্গীর বিশ্ব ইস্তেমায় বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এতেই বুঝা যায় তাবলীগ জামায়াত হকের উপর নেই।

**প্রশ্ন ঃ** তাবলীগ জামায়াতের সাথে সেক্যুলারপন্থীদের সম্পর্ক কেন? তাদের রাজনীতির নিরপেক্ষ ধর্মবাদ ইসলামের কি ক্ষতি করছে?

**উত্তর ঃ** প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে কম্যুনিস্টদের একটি শ্লোগান মনে পড়ে গেল। তারা বলত- 'শুনলে হাসি পায় মোল্লারা ভোট চায়'। এক মসজিদে মাগরিবের নামাজের পর সেক্যুলারপন্থী দলের এক প্রধান নেতা ঘোষণা দিলেন- 'নামাজবাদ ঈমান ও আমলের জরুর জরুর বয়ান হবে, সব ভাই বসি বহুত পয়দা হবে।' এ লোকটি একজন তাবলীগপন্থী চিল্লা ওয়ালা। এ কথা শুনে আমিও সেদিন মনে মনে হাসছিলাম। কম্যুনিস্টদের শ্লোগানে যেমন অজ্ঞতা আছে তেমনি সেক্যুলারপন্থীদলের প্রধান নেতার শ্লোগানেও রয়েছে অজ্ঞতা। যেখানে তার নিজের মধ্যেই ঈমান নেই, সেখানে সে আবার ঈমান ও আমলের দাওয়াত দেয় কেমন করে? যে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে তার মুখে ঈমানের দাওয়াত কি করে শোভা পায়? আফসোস এমন একটি সুযোগ তাবলীগ জামায়াতেই করে দিয়েছে। তাবলীগ জামায়াত ইসলামকে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম হিসেবে প্রচার করছে বলেই অনেক মুসলমান ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করে। রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মবাদের এটাই বড় ক্ষতি।

**প্রশ্ন ঃ** অনেকে বলেন তাবলীগ জামায়াত ইসলামী রাজনীতির কথা না বললেও অনেককে তো রোজা, নামাজী বানাচ্ছে, এটা কি দ্বীনি খেদমত নয়? এটাকে অবহেলার চোখে দেখা কি ঠিক হবে?

**উত্তর ঃ** তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের যতটুকু উপকার হচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে। কারণ নামাজ, রোজা করলেই দ্বীনি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মতো বড় ফরজকে অবহেলা করে সেক্যুলার রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত থাকা কিংবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কোন গুরুত্বই না দেয়া, এসবগুলোই চরম ক্ষতিকর কাজ। এ অর্থে দ্বীনের কিছু অংশ মানা এবং কিছু অংশ মানা হয় না। যারা দ্বীনের কিছু অংশ মানে এবং কিছু অংশ মানে না তারা দুনিয়া এবং আখেরাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে অর্থাৎ আখেরাতে তাদেরকে


www.pathagar.com